চতুর্থ সংখ্যা

রূপকথা

বাংলা ও বাঙালির কথা বলে

আজও উত্তম

সম্পাদকীয়

আজও উত্তম

বাঙালির চিরপরিচিত মহানায়ক উত্তমকুমার। আপন ও আপনার জন। তিনি ছিলেন বাঙালিয়ানার ষোলো আনা দাবিদার। আমরা তাঁকে নানা চরিত্রে, নানা পোশাকে, নানা ভঙ্গিমায় দেখেছি। কখনো তিনি রোম্যান্টিক, কখনো মেজাজি, কখনো বা সন্ন্যাসী। বাঙালির জীবনের এমন কোনো চরিত্রচিত্রন নেই যেখানে আমরা উত্তমকুমারকে পাইনি। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির এই মানুষটা ধুতি, ট্রাউজার, স্যুট, পাঞ্জাবি আবার কখনো গ্রাম বাংলার আটপৌরে রূপে ধরা দিয়েছেন। তাই আমরা উত্তমকুমারকে বাঙালির উত্তম পুরুষ বলে চিহ্নিত করতে পারি। মহানায়কের চলে যাওয়ার চার দশক পরেও তাঁকে ঘিরে কৌতূহলের শেষ নেই। উত্তমকুমারকে নিয়ে অজস্র লেখা বেরিয়েছে, তবু আমাদের আশ যেন মেটে না। মহানায়কের ৯৫তম জন্মবার্ষিকীতে সম্মান জানাতে আমরা নিবেদন করলাম কিছু জানা ও অজানা তথ্য।

সূচিপত্র

শুরুর পাতা	৩-১৩
আলোর দিশারী	১৪-১৫
চেনা মুখ অজানা কথা	১৬
কবিতা	১৭-১৮
নিবন্ধ	১৯-২০
স্বাস্থ্য	২১
রূপলাগি	২২
হেঁসেল	২৩
আইনি পরামর্শ	২৪-২৫
লাইফ স্টাইল	২৬
নাটক	২৭-২৮
খেলা	২৯
ভ্রমণ	৩০

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক

মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক

সৈকত হালদার

সম্পাদনা সহযোগী

রাই দাস

পরিচালনা

মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

অক্ষরবিন্যাস	প্রচ্ছদ
ইন্দ্রবুবলি	**কুন্তল**

চিরদিনের উত্তম

বাঙালির আইকন। উত্তমকুমারকে আমরা বাঙালির উত্তমপুরুষ বলে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর চলে যাওয়ার চার দশক পরেও আজও তিনি স্মৃতিতে সমান উজ্জ্বল। তাঁকে ঘিরে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের জানা। তবু তাঁকে নিয়ে আমাদের অসীম কৌতূহল। মহানায়কের ৯৫তম জন্মদিবসে আমাদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উত্তমকুমার কেন মহানায়ক

সবুজ সেন

চারের দশকের শেষের দিকে বাংলা ছবিতে নিঃশব্দে প্রবেশ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। প্রযোজক ভোলা আঢ্যর 'মায়াডোর' (১৯৪৭) ছবিতে মাত্র ৫ সিকি পারিশ্রমিকে বিয়ের আসরে বর সাজতে হয় তাঁকে। উত্তমকুমারের কথায়, 'সেই দিনই আমার শৈশবকালের স্বপ্ন যেন বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। ওটাই আমার প্রথম সিনেমায় অভিনয় করা (তথ্যসূত্র, আমার আমি, উত্তমকুমার)'। ওই ছবি অবশ্য মুক্তি পায়নি। এরপর নীতিন বসুর 'দৃষ্টিদান' (১৯৪৮) ছবিতে নায়ক অসিত বরণের ছোটোবেলার চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৪৯ সালের 'কামনা' ছবিতে নায়ক হিসাবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। নায়িকা ছিলেন ছবি রায়। এরপরও ৩ বছর অপেক্ষা করতে হয়। পরিচালক নির্মল দে'র 'বসু পরিবার' ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয় সবার নজর কাড়ে। সংবাদপত্রের সমালোচনায় লেখা হয়, সুখেনের চরিত্রে উত্তমকুমার মনে রাখার মতো চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ছবির সাফল্যের রেশই টেনে নিয়ে যায় ১৯৫৩ সালে মুক্তি পাওয়া নির্মল দে'র 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে। জন্ম হয় উত্তম-সুচিত্রা জুটির।

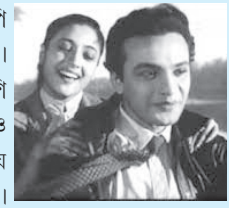

এটাই পরে ইউএসপি হিসাবে কাজ করে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে ২০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন উত্তমকুমার। যার মধ্যে ৮০ ভাগ ছবি হিট। বক্স অফিসের বিচারে সুপারহিট।

বলা হয়, সিনেমা হল ডিরেক্টরস মিডিয়া বা পরিচালকের মাধ্যম। পরিচালকই শেষ কথা বলেন। কিন্তু উত্তমকুমার এই ধারণাটা ভেঙে দেন। তাঁকে ভেবেই ছবির গল্প, চিত্রনাট্য লেখা হত। সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভেবেই গল্প লিখতেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'নায়ক' ছবি করার সময় উত্তমকুমার ছাড়া কারোর কথা ভাবতে পারেননি। শোনা যায়, তার ঠিক আগে সত্যজিতের ৬টি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাকি 'নায়ক' ছবিতে নায়ক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিচালক চরিত্রটা তৈরি করেছিলেন উত্তমকুমারকে মাথায় রেখেই। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'ওঁর মতো স্টার আর হবে না। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দিকপাল। ওঁর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। আশ্চর্য অভিনয় দক্ষতা। উত্তমের মতো কোনো নায়ক নেই, কেউ হবে না।

ওঁর মধ্যে দর্শকদের টেনে রাখার ক্ষমতা আছে। অনেক নায়ক আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভালো অভিনয়ও করেন, কিন্তু উত্তমের মতো কেউ নেই, কেউ হবেও না।' শুধু নায়ক নয়, সত্যজিৎ রায়ের 'চিড়িয়াখানা' (১৯৬৭) ছবিতেও উত্তমকুমারকে প্রধান চরিত্রে দেখা যায়।

অভিনয় জীবনে উত্তমকুমার সমান্তরাল ও বাণিজ্যিক সব ধরনের ছবিতে কাজ করেছেন। বাণিজ্যিক ছবির সাফল্যের নিরিখে কোনো অভিনেতা তারকা বা স্টার হয়ে ওঠেন। উত্তমকুমারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বেঙ্গলিয়ারের গোড়ায় প্রেমিক উত্তমকুমারই জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছোন। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত অগ্নিপরীক্ষা, শাপমোচন, সাগরিকা, হারানো সুর, হার মানা হার, সবার ওপরে, ইন্দ্রাণী ইত্যাদি অসংখ্য ছবি বাঙালির মনে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় অজয় করের 'সপ্তপদী'। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবি চিরন্তন প্রেমের ছবি। ছবির প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে পরিচালক দু'রকম প্রেমের বিস্তার ঘটান। প্রথম দিকে মেডিকেল কলেজের ছাত্র কৃষ্ণেন্দু আর সেনা ছাউনির ডাক্তার ফাদার কৃষ্ণেন্দু, দুটি চরিত্রেই অসাধারণ ছিলেন উত্তমকুমার। সপ্তপদী না দেখলে বোঝা যায় না একটা জটিল চরিত্রকে কীভাবে সহজভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

অনেকে বলেন, হলিউডের পিটার সেলার্সের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাঁর অভিনয়ে। এই ছবির প্রযোজক ছিলেন উত্তমকুমার নিজে। শুধু তাই নয়, ছবিটি জাতীয় পুরস্কারও পায়। সম্ভবত এই ছবিতে দর্শকরা অন্যরকম প্রেমিক উত্তমকুমারকে খুঁজে পেয়েছিলেন। অনেক বেশি রুক্ষ, অনেক বেশি তীক্ষ্ণ।

শুধু প্রেমিক নয়, উত্তমকুমার কমেডিয়ান হিসাবেও ছিলেন অনন্য। বেশ কিছু ছবিতে তাঁর কৌতুক অভিনয় তথাকথিত কমেডিয়ানদের ছাপিয়ে যায়। প্রথমেই বলতে হয়, ১৯৭১ সালে মুক্তি পাওয়া 'ছদ্মবেশী' ছবিটির কথা। পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠীর এই ছবিতে উত্তমকুমার একজন অধ্যাপকের চরিত্রে অভিনয় করেন। নাম ছিল অবনিশ সেন। যিনি বড়ো শ্যালিকার বাড়িতে স্ত্রী সুলেখাকে (মাধবী) পাঠিয়ে দেন। পরে সেখানে নিজে ড্রাইভার গৌরহরি সেজে হাজির হন। ছবিতে প্রশান্ত ঘোষের (বিকাশ রায়) সঙ্গে গৌরহরির প্রথম সাক্ষাৎ বা পুলিশের সঙ্গে কথোপকথন ভীষণ উপভোগ্য। এই ছবিটাই হিন্দিতে রিমেক হয়। ১৯৭৫ সালে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের এই রিমেক ছবির নাম ছিল 'চুপকে চুপকে'। হিন্দিতে উত্তমকুমারের ভূমিকায় ছিলেন বলিউডের স্টার ধর্মেন্দ্র।

ওই সময়ে তৈরি হয় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের

'ধন্যি মেয়ে' (১৯৭১)। কাহিনিকার ছিলেন বনফুল। ছবির বিষয় ফুটবল। প্রেমের নয়, হাসির গল্প। কালীকিঙ্কর সবাইকে হাসিয়ে মাত করে দেন। একই ভাবে আসর মাতিয়েছিল অরবিন্দ

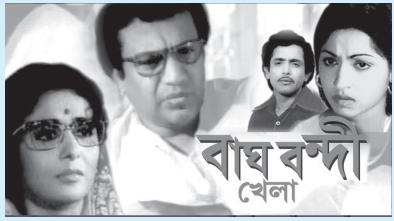

মুখোপাধ্যায় পরিচালিত মৌচাক ছবিতে উত্তকুমারের অভিনয়। জীবনের শেষ ছবি সলিল দত্ত পরিচালিত 'ওগো বধূ সুন্দরী'তেও এই কমেডি সেন্স বজায় রাখেন মহানায়ক। মাই ফেয়ার লেডি'র বাংলা সংস্করণ ছিল ওগো বধূ সুন্দরী। এই ছবির একটা দৃশ্যে দাঁড়ি কাটতে কাটতে উত্তম যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছেন তখনই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু ছবিটা এত ভালো হয় যে ১৯৮১ সালে মুক্তির পরও বক্স অফিসে সাফল্য পায়। বোঝা যায় তিনি না থেকেও রয়েছেন। উত্তমকুমারের আরো দুটি জনপ্রিয় কমেডি ছবি ভ্রান্তিবিলাস ও ব্রজবুলি।

আবার তাঁকে নেগেটিভ চরিত্রে দেখা যায় 'বাঘবন্দি খেলা'য়। পীযূষ বসুর পরিচালনায় এই ছবি মুক্তি পায় ১৯৭৫ সালে। আগের ২০ বছর ধরে বাঙালি দর্শকরা যে উত্তমকুমারকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, সেই চেনা চেহারাটা একেবারে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি 'ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়' চরিত্রে। একজন খারাপ মানুষের চরিত্রে নিজের চাহনি, সংলাপ, উচ্চারণ সব কিছুই বদলে ফেলেছিলেন। এবং তা গ্রহণযোগ্যও হয়। খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করেও 'বাঘবন্দি খেলা'য় তিনি ছিলেন মুখ্য চরিত্র। একইভাবে এক গ্ল্যামারহীন চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তোলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'যদুবংশ' ছবিতে। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এই ছবিতে উত্তমকুমারের চরিত্রের নাম ছিল গনা। সে একটা দোকান চালায়। তাঁকে ঘিরে থাকে উঠতি ছেলেছোকরার দল। একেবারে নায়কোচিত নয়। অথচ তিনি অসাধারণ দক্ষতায় গনা চরিত্রটা ফুটিয়ে তোলেন।

যেসময় বিপাশা, দেওয়া-নেওয়া, লালপাথর-য়ের মতো ছবিতে নিজস্ব নায়ক ইমেজ নিয়ে কাজ করছিলেন উত্তমকুমার, সেই সময় 'অগ্নিশ্বর' হল তাঁর এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। কেরিয়ারের চূড়ান্ত সময়ে তিনি বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করার সাহস দেখান। নায়িকাহীন নায়কও যে কোনো ছবি টেনে নিয়ে যেতে পারে তার একটা বড় প্রমাণ অগ্নিশ্বর ছবিটি। নিজের ওপর কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা যায় তা বুঝিয়ে দেন উত্তমকুমার। পাশাপাশি অবশ্যই উল্লেখ

করতে হয় সলিল দত্ত'র 'স্ত্রী', পীযূষ বসুর 'সন্ন্যাসী রাজা', তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দী', 'জতুগৃহ' বা 'বিচারক'। 'থানা থেকে আসছি'ও মনে দাগ কেটে যায়। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উত্তমকুমার সাতকড়ি হালদারের চরিত্রে অভিনয় করেন। যা ভাবা যায় না। রোম্যান্টিক বা কৌতুক চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তিনি কত বড়ো ছিলেন ওই সব ছবি দেখে বোঝা যায়। উত্তম যখন ৫০ বছর

বয়সে তখন অভিনয় করেন শক্তি সামন্ত'র 'অমানুষ' ছবিতে। ছবিটা সুপারহিট হয়। শোনা যায়, দ্বিভাষিক এই ছবিতে উত্তমকুমার যে মধুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সেটা করার জন্য রাজেশ খান্না পরিচালক শক্তি সামন্তকে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু পরিচালক দুটো ভাষাতেই উত্তমকুমারকে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। আর তার ফল হিসাবে শক্তি সামন্ত'র পরের ছবি 'আনন্দ আশ্রম'য়েও উত্তম-শর্মিলা জুটি হিসাবে সাফল্য পায়। 'নিশিপদ্ম' ছবিতেও উত্তমকুমার এক অন্য ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। ওই ছবিটা হিন্দিতে রিমেক হয়। উত্তমকুমারের চরিত্রে অভিনয় করেন রাজেশ খান্না। শোনা যায়, বলিউডের এই সুপারস্টার নাকি উত্তমকুমারের অভিনীত ছবিটা ১৯ বার দেখেছিলেন ও পরে স্বীকার করেন, 'উত্তমদার মতো অভিনয় করতে পারলাম না'।

নানা ইমেজে নানা ধরনের চরিত্রে নিজের দক্ষতার গুণে উত্তম থেকে তিনি হয়ে ওঠেন 'উত্তমকুমার'। নায়ক থেকে হয়ে ওঠেন 'মহানায়ক'। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবিতে তিনি একজন নায়কের জীবন শুধু নয়, তাঁর মহানায়ক হওয়ার সংজ্ঞাও বদলে দিয়েছিলেন। ছবিটা শুরু হয় বিগ ক্লোজআপ শট দিয়ে। একজনের মাথার পেছন দিক। চুল আঁচড়াচ্ছেন তিনি। তার ওপর টাইটেল কার্ড পড়তে শুরু করে। এরপর একে একে ক্লোজ, মিড, মিড লং, নানা শটে ধরা হয় মানুষটাকে। কিন্তু কখনো মুখ দেখা যায় না। ৬ মিনিট ৫০ সেকেন্ড পর দেখা যায় নায়ক অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ওরফে উত্তমকুমারের মুখ। পরিচালক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যেভাবেই ক্যামেরা ধরা হোক না কেন, দর্শকরা বুঝে যাবেন অরিন্দমের চরিত্রে কে অভিনয় করছেন। আর এখানেই ছিল মহানায়কের ক্যারিশমা। 'নায়ক' ছবির সেই বিখ্যাত সংলাপ 'আই উইল গো টু দ্য টপ, দ্য টপ'- চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে মানুষের মনে। ওটা শুধুমাত্র সংলাপ ছিল না, অভিনয় দক্ষতায় মহানায়ক প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি 'টপ, দ্য টপ'। সেরার সেরা অভিনেতা। তাঁর চলে যাওয়ার চার দশক পরেও তিনি টলিউডে আজও 'মহানায়ক'। বাঙালির চির আপনজন উত্তমকুমার।

তথ্যসূত্র- আমার আমি, উত্তমকুমার, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার লেখালেখি।

অগ্নিপরীক্ষার অজানা কথা

উত্তম-সুচিত্রার সুপারহিট ছবি অগ্নিপরীক্ষা। সেপ্টেম্বর মাসেই মুক্তি পায়। এই ছবি তৈরির নেপথ্যের গল্প শোনাচ্ছেন অভিনেতা **ড. শঙ্কর ঘোষ**।

শুরুতেই বাদানুবাদ। মন কষাকষি। প্রযোজক বনাম পরিচালকের। প্রেক্ষাপট 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির নির্মাণ পর্ব। কী ঘটেছিল সেখানে? একটু পেছন ফিরে দেখা যাক। সাউথ সিঁথির মোড়ে একটা স্টুডিয়ো ছিল। যার নাম ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিয়ো। পরে সেটি লিজ নিয়ে 'এম পি স্টুডিয়ো' প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা ছবির এক সময়ের জনপ্রিয় প্রযোজক মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি পুরোপুরিভাবে গড়ে তুলেছিলেন 'এম পি প্রোডাকশন'। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি 'মায়ার

প্রাণ'। প্রোডাকশন হাউজের প্রথম নাম রেখেছিলেন মায়ের প্রাণ প্রোডাকশন। পরে নাম দেন এম পি প্রোডাকশন। তিনি মাস মাইনে দিয়ে শিল্পী-কলাকুশলীদের রেখেছিলেন। খানিকটা বীরেন্দ্র সরকারের নিউ থিয়েটার্সের আদলে। এখানে কাজ করতেন বিভূতি লাহা (অগ্রদূত গোষ্ঠীর প্রধান)। ডাকতাম খোকা। খোকাবাবুর সঙ্গে মুরলীবাবুর সম্পর্ক ছিল মধুর। তাছাড়া বিভূতি লাহা একসঙ্গে সামলাতেন পরিচালনা, ক্যামেরা ও চিত্রনাট্য লেখার কাজ। তিনি একদিন বিকেলে মুরলীবাবুকে একটি সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস পড়তে দিলেন। আশাপূর্ণা দেবীর 'অগ্নিপরীক্ষা'। কয়েকদিনের মধ্যে উপন্যাসটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে মুরলীবাবু তাঁর অফিস ঘরে ডেকে পাঠালেন বিভূতি লাহাকে। জানালেন, 'গল্পের রাইট কিনুন। স্ক্রিপ্ট তৈরি করে ফেলুন। কোন কোন অভিনেতাকে নেবেন তাও ঠিক করে ফেলুন'। সব কাজ সুষ্ঠুভাবে করলেন বিভূতি লাহা।

এক বিকেলে বিভূতি লাহা চিত্রনাট্য নিয়ে হাজির মুরলীবাবুর অফিসঘরে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর শিল্পী বাছাইয়ের প্রসঙ্গ এল অবধারিতভাবে। বিভূতি লাহা জানালেন, নায়িকার বাবা ও মায়ের চরিত্রে কমল মিত্র ও চন্দ্রাবতী দেবী, নায়িকার ঠাকুমার চরিত্রে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, নায়কের ঠাকুরদার ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলি। নায়ক কিরীটির চরিত্রে উত্তমকুমার আর নায়িকা তাপসীর চরিত্রে সুচিত্রা সেন। এতক্ষণ সব ঠিকঠাক চলছিল, নায়ক-নায়িকার নাম শুনে রাগে ফেটে পড়লেন মুরলীবাবু। বললেন, 'উত্তম তো আমার প্রোডাকশন হাউসের শিল্পী। ওকে নায়ক করে সহযাত্রী, নষ্টনীড়, সঞ্জীবনী ছবিগুলোর তো ভরাডুবি হয়েছে। ওকে দর্শকরা ডাকে ফ্লপ মাস্টার জেনারেল হিসাবে। আর সুচিত্রার সুন্দর মুখ ছাড়া কীই বা আছে'? রাগটা একটু পড়তেই তিনি পরামর্শ দিলেন, 'কিরীটির চরিত্রে বিকাশ রায়কে আনুন আর তাপসীর চরিত্রে অনুভা গুপ্ত। দেখবেন ছবি জমে গিয়েছে'। বিভূতি লাহাও ছাড়ার পাত্র নন। তিনি স্পষ্ট করে জানালেন, 'উত্তম-সুচিত্রাকে যদি নেন, তবেই এ ছবি আমি করব। নতুবা নয়। আপনি বরং অন্য পরিচালক দেখে নিন। শিল্পী বাছাইয়ের এব্যাপারে আমি সমঝোতা করতে পারব না'। মুরলীবাবু প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু ঘাটালেন না। কারণ বিভূতি লাহা এম পি প্রোডাকশনের অ্যাসেট। তাঁর পরিচালনায় 'বাবলা' ছবিটি 'কার্লোভি ভ্যারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে' বিদেশের বাজারে পুরস্কৃত প্রথম বাংলা ছবি। মুরলীবাবু সম্মতি দিলেন বিষয়টায়। কিন্তু তিনি নিজে একদিনও শুটিং চলাকালীন ফ্লোরে পা রাখলেন না। এমনকী ছবি যখন মুক্তির প্রতীক্ষায় তখন ফাইনাল প্রোডাকশন দেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল ওরিয়েন্ট সিনেমা হলে (ডি লুরেন্স ফিল্মসের সব ছবিরই ওরিয়েন্ট প্রোডাকশন দেখানো হত)। সেখানেও গেলেন না প্রযোজক মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। তারপর এল 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবির মুক্তির দিন। ১৯৫৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ছবি মুক্তি পেল উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এই চেইনে। প্রসঙ্গত, বলে রাখি, এই চেইনে একটি প্রেক্ষাগৃহেরও আজ আর অস্তিত্ব নেই। যাই হোক, ছবির হাউসফুলের বোর্ড আর নামেই না। এর আগে উত্তম-সুচিত্রা কিছু ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন ঠিকই (সাড়ে চুয়াত্তর, সদানন্দের মেলা, ওরা থাকে

ওধারে, মরণের পরে ইত্যাদি) কিন্তু রোম্যান্টিক জুটি হিসাবে তাঁদের প্রতিষ্ঠা হল এই 'অগ্নিপরীক্ষা' ছবি থেকে। বিশেষ করে একেবারে শেষ দৃশ্যে উত্তম-সুচিত্রার সেই নিবিড় মধুর আলিঙ্গন দৃশ্য। ওই দৃশ্যের টানে দর্শকের ঢল নামল প্রেক্ষাগৃহে। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সুচিত্রা-উত্তম তারকায়িত সব ছবিতে পরিচালকরা এমন অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন দৃশ্য অপরিহার্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। রাজ কাপুর-নার্গিসের জনপ্রিয় জুটির প্রতিযোগী হয়ে উঠল উত্তম-সুচিত্রার জুটি। এদিকে, এই ছবি থেকে শুরু হল সুচিত্রা সেন ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মিলিত মাধুরী। 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' গানে মুগ্ধ হয়ে রয়েছে এই প্রজন্মের শ্রোতারাও। তার সঙ্গে রয়েছে 'কে তুমি আমারে ডাকো', 'যদি ভুল করে ভুল মধুর হল', 'ফুলের কানে ভ্রমর আনে' প্রভৃতি সব গান। এই ছবি থেকে সুচিত্রা সেনের লিপে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও হয়ে গেলেন অপরিহার্য নেপথ্য গায়িকা। সর্বোপরি আরেকটি ঘটনা কাকতালীয় হলেও সত্যি যে, 'অগ্নিপরীক্ষা' মুক্তির দিনটি ছিল ৩ সেপ্টেম্বর। এই দিন মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মদিনও।

নায়কোত্তম অরিন্দম

কল্লোল অস্থির চক্রবর্ত্তী

নায়ক এমন একটা সিনেমা যা সত্যজিৎ রায় ও উত্তমকুমারের জীবনে একটা মাইলস্টোন। অনেকে ভাবেন, সত্যজিৎ রায়ের জীবনে কম, উত্তমের জীবনে বেশি। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, সত্যজিৎ তাঁকে ভেবেই নায়ক ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরে এটা সত্যজিৎ রায়ের একটি মৌলিক গল্প ও চিত্রনাট্য। তিনি বাংলা ছবির জিনিয়াস ডিরেক্টর নির্মলে পরিচালিত

'চাঁপা ডাঙার বউ' ছবি থেকেই উত্তমকুমারকে শিল্পী হিসাবে খুব পছন্দ করতেন। তারপর ইচ্ছা থাকলেও বিষয়ের জন্য বা বাজেটের জন্য তাঁর সঙ্গে কাজের ভাবনাটা মাথায় আনতে পারেননি। আনলেও উত্তমকুমার ব্যস্ততার জন্য সময় দিতে পারেননি। কিন্তু গুটি বসন্তে আক্রান্ত উত্তমকুমারকে নিয়ে যখন ফিল্ম জগতে জল্পনা চলছে যে তিনি আর কামব্যাক করতে পারবেন কিনা ও ফিরে এলেও উত্তমের আগের সেই গ্ল্যামার আদেও অক্ষত থাকবে কিনা তখনই নায়কের জন্য সত্যজিৎ রায়কে মহানায়ক টানা ডেটস দেন। তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বা উপসর্গমুক্ত হওয়ার আগেই এই ছবির শুটিং শুরু হয়ে যায়। একজনের সঙ্গে কাজ করার আকুতি কতখানি থাকলে একজন পরিচালক একজন নায়ককে ভেবে গোটা একখানা চিত্রনাট্য বানিয়ে ফেলতে পারেন। উত্তমকুমার সেই সময় বাংলা চলচ্চিত্র জগতে এত বড় একজন স্টার, এটা সত্যজিৎ রায়ের কাছে একটা বড় ফ্যাক্টর তো ছিল। কারণ ক্যারেক্টারটাই একজন ম্যাটিনি আইডলের। আর কতটা সম্মান সত্যজিৎ রায় উত্তমকুমারকে করতেন তার প্রমাণ, উত্তমকুমারের প্রয়াণ সভায় তাঁর সেই অমর উক্তি- 'উত্তমের মত কেউ ছিল না, উত্তমের মত কেউ হবে না'। যাঁর সমকক্ষ কোনও কালেই কেউ নেই, তাঁর সঙ্গে কে না কাজ করতে চাইবে!

শুধু ভারতের ইতিহাসেই নয়, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে নায়ক কিন্তু একটা অভিনব ছবি। এধরনের সিনেমা বিশ্বেও বিরল। একজন পর্দার নায়কের ব্যক্তিগত জীবনের ওঠাপড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, ইমোশন, নারী জীবন সবটা যেভাবে এখানে চিত্রায়িত হয়েছে, আর কোথাও সেভাবে হয়নি। অরিন্দম মুখার্জি এখানে হিরোর নাম। এবার উত্তমকুমারের নয়, ওই নায়ক চরিত্র অর্থাৎ অরিন্দম মুখার্জির চরিত্র বিশ্লেষণে যাব। তাঁর চরিত্রের কতগুলো শেডস আমরা দেখতে পাচ্ছি হিসাব করি।

১) উদ্ধত অরিন্দম, ২) ব্যক্তিত্ববান অরিন্দম,
৩) ভদ্র অরিন্দম, ৪) মিশুকে অরিন্দম,
৫) স্বপ্নালু অরিন্দম, ৬) মাতাল অরিন্দম,
৭) ইমোশনাল অরিন্দম

হয়ত আরো আছে। আপাতত এই সাতটি শেডস নিয়েই আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। যাঁরা ছবিটি দেখেছেন তাঁরা জানেন, অরিন্দমের চরিত্রে আরো কিছু শেডস আছে। তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনায়াসেই একটা বই লিখে ফেলা যায়। এটা ছবিটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, রিল থেকে চরিত্রটি রিয়ালে চলে আসে। চরিত্রটির পরত ধীরে ধীরে খুলবে। আর সেটা তাক লাগানোর মতই। অনেকে বলেন নায়ক উত্তমকুমারের জীবনের সেরা ছবি কিন্তু সত্যজিতের নয়। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, এই ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য সত্যজিতের। অন্য ক্ষেত্রে স্টোরিলাইন পেয়েছেন এখানে কিন্তু প্রায় পুরোটাই তাঁকে ভাবতে হয়েছে। প্রায় বললাম একারণেই যে অভিনয়ের সময় কিছু জায়গা উত্তমকুমারও ভেবেছেন এবং সেটা বিভিন্ন সময়ে তাঁর রিঅ্যাকশনে অসাধারণভাবে ধরা পড়েছে। এটা কেবল তাঁর মতো সেরিব্রাল অ্যাক্টরের পক্ষেই সম্ভব।

১) **উদ্ধত অরিন্দম**- সত্যজিৎ রায়ের এই ছবি শুরুর সময় দেখা যাচ্ছে উত্তমকুমার চুল আঁচড়াচ্ছেন। তারপর ড্রেসআপ করছেন। সেখানে বেশ উদ্ধত তিনি। বন্ধু কাম সেক্রেটারি জ্যোতি ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলছেন নিজস্ব মেজাজে। তাতে অবশ্য ঠিকরে বেরোচ্ছে নায়কের আত্মবিশ্বাস। সত্যজিৎ রায় এই ছবিতে উত্তমের যে শেড দেখিয়েছেন, সেটা কিন্তু একবারই দেখিয়েছেন। সারা ছবিতে আর কোথাও তাঁকে ফিরিয়ে আনেননি। উদ্ধত অরিন্দমের জায়গাটা ছোট। কিন্তু শুরুতেই ওই চরিত্রটাকে সত্যজিৎবাবু ডাউন টু আর্থ দেখালেন না। তাহলে স্টারডম ওখানেই শেষ হয়ে যাবে। কত বুদ্ধি করে রায়মশাই কাহিনির বিস্তার ঘটিয়েছেন। অরিন্দমের চুল আঁচড়ানো হল। পিছনে ইউ কাট। উত্তমকুমারের নিজস্ব স্টাইল। সেটা দেখে এক সময় সারা কলকাতা দিওয়ানা হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় শুরুটা করেছেন সেখান থেকে। যখন দর্শক নায়ককে দেখছেন, তখন উত্তমকুমার লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নায়ক ও তাঁর চুলের কাটও ততটাই পপুলার। এটা দিয়ে যেই শুরুটা হল, দর্শক নায়ক ছবির নায়ক হিসাবে মহানায়ককে গ্রহণ করে নিল। কারণ, নিজের বাড়িতে উত্তমবাবু কীভাবে তাঁর সুন্দর কেশরাশি আঁচড়ান দর্শক তা চোখের সামনে গিলছে। সত্যজিৎ রায়ের বাকি সিনেমাগুলোকে কিন্তু লোকে বলেছে ওনারই ছবি। সেই ছবিতে যত বড় স্টারই কাজ করে থাকুন না কেন। নায়ক আর চিড়িয়াখানা ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু লোকে বলেছে উত্তমকুমারের ছবি। এটাই উত্তমকুমারের ক্যারিশমা। স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ও তাঁকে নিজের মত করে কাজ করার

সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অরিন্দমের উদ্ধত আচরণের সব থেকে বড় উদাহরণ যখন সে বলছে, 'আমি তো আছি, সালা পাবলিক, সালাদের স্টিমরোলার চালিয়ে....' ইত্যাদি ইত্যাদি।

২) **ব্যক্তিত্ববান অরিন্দম**- এবার সত্যজিৎ রায় তাঁর মধ্যে এনেছেন ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া। গোটা ছবিতে যাঁর সঙ্গেই কথা বলেছেন অরিন্দম নিজের ওজন বজায় রেখে কথা বলেছেন। বড়দের দিয়েছেন প্রাপ্য মর্যাদা, ছোটদের স্নেহ আর সমবয়সীদের মানবিক। সবই তাঁর অরিন্দমসুলভ। উত্তমকুমার সুলভও হয়ত বলা যায়। ব্যক্তিত্ব আছে বলেই অরিন্দম হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেন। প্রোডিউসার হীরালালের কাছ থেকে ফিল্মের অফার পেয়েও চুক্তি সই করলেন না। পরক্ষণেই একটা ফোন এল। উলটো দিকে নারীকণ্ঠ। অরিন্দম কোন কারণে তাঁর ওপর চটা। অথচ একটাও বাজে কথা না বলে কাউকে কীভাবে নকআউট করতে হয় সেটা যেন দেখিয়ে দিলেন বাংলার সবাইকেই।

৩) **ভদ্র অরিন্দম**- এর পরের দৃশ্যে আমরা দেখি অরিন্দম ট্রেনে উঠেছেন ও একজন সিনিয়র ব্যক্তি মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলছেন। একজন প্রবীণকে যেভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলা উচিত অরিন্দম ঠিক সেভাবেই কথা বলেছেন। এরপরেই নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এলেন ও অটোগ্রাফ চাইলেন। অরিন্দম ভদ্রভাবে তাঁকে বসতে বললেন ও বাংলা ছবি সম্বন্ধে সমালোচনা খুব সহজভাবে নিলেন। একটা সংলাপে 'ম্যানার্স' শব্দটাও আমরা পাই। কাজেই অরিন্দমের ভদ্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কোন জায়গা নেই।

৪) **মিশুকে অরিন্দম**- এর পরবর্তী দৃশ্যগুলোতে আমরা দেখতে পাই, অরিন্দম প্রথম প্রথম পাত্তা কম দিলেও বা স্টারসুলভ অহমিকা দেখালেও পরে

নায়িকা শর্মিলার সঙ্গে সহজে মিশছেন ও তাঁকে কাজের কথা ছাড়াও ব্যক্তিগত অনেক কথা বলে ফেলছেন। অর্থাৎ পেশাদার খোলসের আড়ালে তাঁর একটা মিশুকে মন আছে এটা আমরা বুঝতে পারি। যদিও ছবিটিতে অরিন্দমকে সবার সঙ্গে এতটা সহজভাবে মিশতে দেখা যায়নি। অরিন্দম কিন্তু বেশ আলাপী মানুষ। তবে সে আলাপ করে লোক বুঝে। 'আলাপটা করে গেলাম'- এক সিনিয়র ভদ্রলোককে বলছেন। তারপর শর্মিলা আলাপ করতে এলে তাঁকেও বসতে বলছেন ও প্রথম আলাপেই বাংলা ছবি নিয়ে কিছু মন্তব্য করছেন। সেই লোকটা একটা সময় অচেনা মহিলাটির কাছে নিজেকে এক্সপোজ করে দিচ্ছেন। এখানেই হিউম্যানিটির খেল যে, মহিলাটিও যেন বুঝেছেন যতই যা করুন, ভেতরের মানুষটা ভীষণ ভাল।

৫) **স্বপ্নালু অরিন্দম**- সিনেমার অনেকটা জুড়েই আছে স্বপ্ন দৃশ্য। টাকার পাহাড় হোক বা নায়িকার খোঁজ করা, শঙ্করদার প্রেতাত্মা হোক বা প্রমীলার স্বামী সব ঘুরে ফিরে এসেছে স্বপ্নে। স্বপ্নে কখনো তিনি হাসছেন, কখনো ভয় পাচ্ছেন। সে ভয় বিফলতার, সে ভয় কিছু হারানোর। আছে কিছু ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্য। তাও কিন্তু বকলমে স্বপ্নই। আছে স্ট্রাগলার অরিন্দমের বড় হওয়ার স্বপ্ন। স্ট্রাগলিং পিরিওডে একাধিকবার টেবিল চাপড়ে বলছেন-'আই উইল গো টু দ্য টপ'। একজন স্বপ্নসাহসী মানুষই কেবল এটা বলতে পারে।

৬) **মাতাল অরিন্দম**- শুরুতেই অরিন্দম অবাঙালি প্রোডিউসারকে একটা গল্প বলেন। তারপর একটি

মদের বোতল ব্যাগে ঢোকান। ট্রেনে একসময় সেটি খান ও তারপর রেলের কামরার ইনচার্জ ও শর্মিলার সঙ্গে মাতলামি করে কথা বলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর অভদ্রতা প্রকাশ পায় না কেমন যেন একটা বেপরোয়াভাব আর তারপরেই বিষণ্ণতা। কামরার সহযাত্রীদের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নেন। অথচ মুকুন্দ লাহিড়ী যখন তাঁর বাড়িতে আসেন, হুইস্কি খাওয়ালেও নিজে খেতে চান না।

৭) **ইমোশনাল অরিন্দম** - অরিন্দমের আবেগটা চাপা কিন্তু যখন সেটা বেরিয়ে আসে তা তীব্রভাবে বেরিয়ে আসে। এটা বাস্তব যে ইমোশনাল মানুষরাই জীবনে সফল হন কিন্তু তাঁদের বড় গুণ নিজেদের আবেগকে ঠিক হজম করতে পারেন। তা করতে গিয়ে তাঁদের নিজের সঙ্গে যে কী প্রবল যুদ্ধ করতে হয় তা কিন্তু এই অরিন্দম চরিত্রটাকে দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। সেই যুদ্ধে কখনো কখনো হেরেও যায়। শেষ দৃশ্যে ট্রেনের দুই যাত্রী যখন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, বেজায় জটিল নারীচরিত্রটি, কিছুই বুঝতে না দিয়ে যতটা সহজে বিষয়টিকে মেনে নিল, অরিন্দম ততটা সহজে পারল কি? হ্যাঁ, সহজে না হলেও পারল। আসলে গল্পের নায়ক অরিন্দম কলকাতা ছেড়ে দিল্লি পালাতে চাননি, স্টার অরিন্দমের থেকে মানুষ অরিন্দম ক্ষণিকের জন্য হলেও মুক্তি চেয়েছিল।

আমার শৈশবের স্মৃতি উত্তমকুমার

সৃজিতা (বান্টি) ভদ্র, অভিনেত্রী

আমার শৈশবের স্মৃতি উত্তমকুমার। বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার একটা বিরাট নাম। শৈশব থেকে তাঁর প্রচুর সিনেমা দেখে বড় হয়েছি। সব ছবির সব চরিত্রই আমাকে ভীষণ টানে। ওনার অভিনয় দেখলে আমি মোহিত হয়ে যাই। কী অসাধারণ অভিনয়, কী ব্যক্তিত্ব। সলিল দত্ত পরিচালিত 'ওগো বধূ সুন্দরী' উত্তমকুমারের শেষ ছবি। এই ছবিতে মৌসুমী চ্যাটার্জি অভিনীত সাবিত্রী চরিত্রটি আমাকে ভীষণ টানে। ভূতের রাজা তিনটি বর দিলে আমি একটি বর চাইব উত্তমকুমারের সঙ্গে সাবিত্রী চরিত্রে অভিনয় করতে চাই।

দারুণ কমেডি ও মিষ্টি একটি ছবি। আর আছে উত্তমকুমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্ক্রিন শেয়ার। উফঃ! ভাবা যায় না।

বেছে নেব মৌচাক

প্রতাপ মণ্ডল, অভিনেতা

মহানায়ক উত্তমকুমার আমাদের কাছে এক প্রবাদপ্রতিম পুরুষ। তিনি বাঙালিদের কাছে এক গর্বের মানুষ, বাঙালির নিদর্শন-প্রতীক। তাঁর সম্পর্কে কোনো কথা বলা মানেই বোকামি। আমার সেই শিক্ষা বা বোধ নেই ওনার সম্পর্কে কোনো মতামত রাখার। তিনি আমাদের কাছে আইডল। উত্তমকুমার এমন একজন মানুষ যে একজন অভিনেতা হিসেবে তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে থাকি। সমরেশ বসুর লেখা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'মৌচাক' সিনেমায় রঞ্জিত মল্লিকের সীতেশ চরিত্রটা আমার কাছে ভীষণ প্রিয়। চরিত্রটার এতো শেড, এত সুন্দর প্রেজেন্স, প্রতিটি কো-অ্যাক্টরের সঙ্গে এক-একরকম চরিত্রায়ন একজন অভিনেতার কাছে লোভনীয়। সেইসঙ্গে মহানায়কের সাবলীল প্রাণবন্ত অভিনয়। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে এরকম একটা চরিত্রে অভিনয় করা আমার কাছে স্বপ্ন। ভগবানের কাছে কোনো বর চাইলে এই মৌচাক সিনেমায় মহানায়কের সহঅভিনেতা রঞ্জিত

ফিরে দেখা

উত্তম-সুচিত্রা জুটির ছবি

বাংলা সিনেমার অমর জুটি। ২ জনে একসঙ্গে প্রায় ৩০টা ছবি করেছেন। উত্তম-সুচিত্রা জুটির ছবি- সাড়ে চুয়াত্তর (১৯৫০), সদানন্দের মেলা (১৯৫৪), ওরা থাকে ওধারে (১৯৫৪), অগ্নিপরীক্ষা (১৯৫৪), গৃহপ্রবেশ (১৯৫৪), মরণের পরে (১৯৫৪), অন্নপূর্ণা মন্দির (১৯৫৪), শাপমোচন (১৯৫৫), সবার উপরে (১৯৫৫), সাঁঝের প্রদীপ (১৯৫৫), সাগরিকা (১৯৫৬), শিল্পী (১৯৫৬), একটি রাত (১৯৫৬), ত্রিজামা (১৯৫৬), পথে হল দেরী (১৯৫৭), হারানো সুর (১৯৫৭), চন্দ্রনাথ (১৯৫৬), জীবন তৃষ্ণা (১৯৫৭), ইন্দ্রাণী (১৯৫৮), রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত (১৯৫৮), সূর্য্যতোরণ (১৯৫৮), চাওয়া-পাওয়া (১৯৫৯), সপ্তপদী (১৯৬১), বিপাশা (১৯৬২), গৃহদাহ (১৯৬৭), কমললতা (১৯৬৯), নবরাগ (১৯৭১), আলো আমার আলো (১৯৭২), হার মানা হার (১৯৭২), প্রিয় বান্ধবী (১৯৭৫)।

উত্তম-সুপ্রিয়া জুটির ছবি : চিরদিনের, বনপলাশীর পদাবলী, কাল তুমি আলেয়া, লাল পাথর, শুন বরনারী, মন নিয়ে, শুধু একটি বচর, সন্ন্যাসী রাজা, দই পৃথিবী, দুই পুরুষ ইত্যাদি।

উত্তমকুমার অভিনীত হিন্দি ছবি : ছোটিসি মুলাকাৎ (১৯৬৭), দেশপ্রেমী (১৯৮২), মেরা করম মেরা ধরম (১৯৮৭), অমানুষ (১৯৭৪), আনন্দ আশ্রম (১৯৭৭), বন্দী (১৯৭৮), নিশান।

উত্তমকুমার পরিচালিত সিনেমা : কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী (১৯৮১), বনপলাশীর পদাবলী (১৯৭৩), শুধু একটি বছর (১৯৬৬)।

উত্তমকুমার প্রযোজিত সিনেমা : গৃহদাহ (১৯৬৭), হারানো সুর (১৯৫৭), সপ্তপদী (১৯৬১), ছোটিসি মুলাকাত (১৯৬৭)।

উত্তমকুমার সুরারোপিত সিনেমা : কাল তুমি আলেয়া (১৯৬৬)

অসমাপ্ত ছবি- ওগো বধূ সুন্দরী (পরিচালনা সলিল দত্ত), ইমন কল্যাণ (পরিচালনা শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়), খনা (পরিচালনা পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়), রাজাসাহেব (পরিচালনা পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রতিশোধ (পরিচালনা সুখেন দাস), হব ইতিহাস (পরিচালনা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়)।

আলোর দিশারি

অঞ্জন দে

সিস্টার এই অধ্যায়টা আপনি ঠিক করে লেখেননি। আমার ভাবনার ধারা আপনি বুঝতেই পারেননি। এটা আমি ছিড়ে ফেলব। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক।

তাই যদি করেন তাহলে আমি চললাম। আমি আপনার চিন্তাগুলো যতটা সম্ভব সততা ভাষায় বর্ণনা করছি। এর থেকে ভাল কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন মিস্টারও।

তুমুল ঝগড়া তর্ক লতান্তরের অবসান হল চায়ের উষ্ণ উত্তাপে। হাজির হলেন গৃহকর্ত্রী স্বত্রস্তনির্মিত চায়ের উপকরণ নিয়ে ভদ্রলোক হলেন আচার্য্য জগদীশ চন্দ বসু। বদমেজাজী ঠোঁটকাটা— কোন তালগা ভদ্রতার ধার ধারতেন না। সিস্টার এলেন ভগিনী নিবেদিতা— তিনিও ছেড়ে কথা কইবার মানুষ নন। অকপট যে কোন ব্যাপারে। আর গৃহকর্ত্রী হলেন অবলা বসু।

দার্জিলিঙে বসে জগদীশচন্দের সঙ্গে তাঁরই প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শিল্পিত গদ্যে রূপান্তরিত করছেন ভগিনী নিবেদিতা। সবসময় এই যৌথপ্রয়াস নিষ্কন্টক হতো না। ব্যক্তিত্বের সংঘাত, অথচ এই দুই প বল ব্যক্তিত্ব কিভাবে কাছাকাছি এলেন, তা বড়ই আশ্চর্য্যের।

১৮৮৫ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতে ফিরে এসে পেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হল। প্রথমেই তিনি বর্ণবাদের শিকার হল- ব্রিটিশ অধ্যাপকদের তুলনায় তাঁর বেতন স্তর অনেক কম। প্রতিবাদস্বরূপ তিন বছর তিনি বিনা বেতনে পড়িয়েছিলেন। দীর্ঘকাল প্রতিবাদের পর তাঁর বেতন ব্রিটিশদের সমতুল্য করা হয়েছিল। প্রতিদিন কলেজে অধ্যাপনার পর যেটুকু সময় থাকত তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতেন তাঁর কলেজের ২৪ বর্গফুট ছোট ঘরে।

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি। মোম্বাসা জাহাজ এসে লাগল কলিকাতায়। ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখলেন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। তাঁকে নিতে এসেছেন গৈরিক বস্ত্র পরিহিত এক সন্ন্যাসী। যিনি বছর কয়েক আগে প্রথম সাক্ষাতে বদলে দিয়েছিলেন মার্গারেটের জীবনের গতিপথ। কয়েকমাস আগে এই সন্ন্যাসী চিঠিতে আহ্বান জানিয়েছেন নোবেলের মত মহীয়সী মারীকে বড়ো দরকার ভারতবর্ষের।

১৮৯৮ সালের মার্চ মাস। প্রেসিডেন্সি কলেজে স্বনামধন্য পদার্থ বিজ্ঞানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এই শেতাঙ্গ নারী মার্গারেট আর সারা বুল। অবশেষে দেখা হল। অবাক হয়ে তাঁরা তাকিয়ে আছেন স্রষ্টার দিকে বেতার বিজ্ঞানের পথিকৃৎ - এই ছোটো ঘরে বসেই তিনি আধুনিক পদার্থবিদ্যার ওপর মৌলিক গবেষণা করছেন। এত অনাড়ম্বর-সাদামাটা আয়তনে— অথচ সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সাধনায় রত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র। অবাক বিস্ময় মার্গারেট আর সারা বুল শুনেছেন বিজ্ঞান সবিকের কথা।

প্রথম আলাপের এই মুগ্ধতা কালক্রমে জীবনব্যাপী নিবিড় বন্ধুত্বের রূপ পায়। অন্তরের দূরদর্শিতায় নিবেদিতা বুঝতে পারলেন। বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া ভারতের ব্যবসারিক জীবনের উন্নতি অসম্ভব। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই বিজ্ঞানসাধক মানুষটির গবেষণা অপরিসীম। আর জগদীশচন্দ্র, যিনি গবেষণার প্রতি পদে প্রতিকূলতা, সরকারের উদাসীনতা এমনকী চরম অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হতে বিপর্যস্ত —তাঁর মনের ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বলে উঠল।

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের গবেষণার কথাগুলি প্রসেশের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন— কিভাবে বোঝাবেন তাঁর গবেষণালব্ধ ফল বিশ্বের শরীরতত্ত্ববিদ বা পদার্থবিদদের। এগিয়ে আসেন নিবেদিতা ওই জটিল বিজ্ঞানভাবনাকে লিখিতরূপ দেন তাঁর মেধাবী ও শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে। জগদীশচন্দ্রের ভুবনবিখ্যাত গবেষণাধর্মী লেখা, যা পরে ধারাবাহিকভাবে র‍্যয়াল সোসাইটির পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। সেইসব লেখার সম্পাদনার কাজও করতেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিবরণ যাতে হারিয়ে না যায়, তাতে তাহা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছোয়, সেজন্য তিনি বলেছিলেন—'আমার কলম তোমার চিন্তাকে ভৃত্যের মতো অনুসরণ করবে।

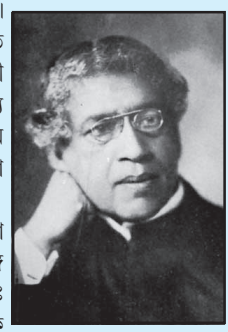

১৯১১ সাল, অক্টোবরের পূজো কাটাতে বসু পরিবার দার্জিলিঙে। সঙ্গে নিবেদিতা—শরীর ভালো নেই। ডঃ নীলরতন সরকারও দার্জিলিঙ তাঁকে দেখে যাচ্ছেন। দিনটি ১৩ অক্টোবর নিবেদিতার ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মেঘমুক্ত আকাশ কমলা রঙের বস্ত্র পরিত্রিতা সূর্যোদয়ের আলোয় তাঁর ঘর আলোকিত। অস্ফুটে এলে উঠলেন শেষ উচ্চারণ 'The boat is sirkim, atill I shall see the sumise.'

নিবেদিতা নেই। এই আকস্মিকতায় প্রস্তুত ছিলেন না কেউই। জগদীশচন্দ্র দিশেহারা। নিবেদিতার প্রয়াণের কুড়ি দিন পরে তাঁর বোন মেরি উইলসনকে জগদীশচন্দ্র লিখেলেন— যে বইটি সে আমাকে লিখতে সাহায্য করেছিল, তা আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে।' আরও লিখছেন— 'নিবেদিতা থাকলে কিন্তু একদন্ত সময় নস্ট হতে দিত না। তবে সে তো শরীরিনী নয়— সে মনোময়ী'।

১৯১৭ সাল ৩০ নভেম্বর। জগদীশচন্দ্রের ৬০তম জন্মদিন। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। বিজ্ঞানসাধক আর তার আলোর দিশারী নিবেদিতার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল। সেদিন ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণাকে বিশ্বদরবারে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠা করলেন নিবেদিতার 'ম্যান অফ সায়েন্স'। স্যার পথ প্রদর্শক সেই জ্যোর্তিময়ীকে স্মরণ করে জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারদেশে প্রাচীরে খোদিত করে রাখলেন দীপ হাতে অবগুন্ঠিতা এক নারীমূর্তি। নীচে লেখা 'লেডি অফ দ্য ল্যাম্প'।

বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রের ভাষণে নিবেদিতার প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু কোথাও তাঁদের নাম উল্লেখ না করে বলেন— 'যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিতান ছিলেন, তখনও দুই একডালের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আজও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ঢুকলেই বাঁ দিকে চোখে পড়বে ছোটো একটি পাথরের পমাকৃতি জলাশয়। পাশেই সেই নামহীন মূর্তি কোথাও কোনো পরিচয় লেখা নেই— যা ভগিনী নিবেদিতার প্রতিরূপ বলে কথিত। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর কৃতি ছাত্র কৃষি বিজ্ঞানী বশিশ্বর সেনের তথ্য থেকে জানা যায় ওই জলাশয়ের নীচেই ভগিনী নিবেদিতার চিতাভস্ম রাখা আছে। বিজ্ঞান মন্দিরের দরজার চূড়ায় বজ্রচিহ্ন— যা ভগিনী নিবেদিতার বড়ো পছন্দের। কোথাও তাঁর নাম খোদাই করা নেই। তবু বিজ্ঞান মন্দিরের সর স্থানে তাঁর নিরুচ্চার উপস্থিতি। নামের ক্ষুদ্রতায় তাঁকে বাঁধতে চাননি জগদীশচন্দ্র। বিজ্ঞান সাধনায় মগ্ন তরুণ গবেষকদের তিনিই আলোর দিশারী। আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আজও তিনি পথ দেখিয়ে চলেছেন তরুণ সাধকদের। ঠিক যেভাবে আলোয় দীপ্তিলয় করে তুলেছিলেন পরাধীন ভারতের এক বিজ্ঞানসাধকের দুর্গম যাত্রাপথ।

কর্পোরেট জগতে কাজের সূত্রে রাজনীতিবিদ থেকে শিল্পপতি নানা ধরনের মানুষের কাছাকাছি এসেছেন কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট **মানসকুমার ঠাকুর**। এই বিভাগে প্রতি সংখ্যায় তিনি একজন মানুষের অজানা কথা তুলে ধরছেন।

বিজনেস লিডার সুব্রাহ্মনীয়াম রামোদরাই

এই পর্বে আমি এমন একজনের কথা লিখছি তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা ধর্মীয় গুরু নন, অথচ আমার জীবনে দেখা 'বিজনেস লিডার'-র মধ্যে তিনি অন্যতম। সময়টা ২০১৫ সালের শেষের দিকে, তখন আমি ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টস-র ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমার মাথায় ঘুরছিল বাংলার এত ছেলে-মেয়ে বেকার। কিভাবে তার সমাধান সূত্র বের করা যায়। রাজ্যস্তরের অনেক নেতার সঙ্গে আলোচনা করে কোনো সুফল না পেয়ে শেষে মনে করলাম একবার শেষ চেষ্টা করি। একবার মুম্বই যাই ও শেষ পর্যন্ত আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছোই। সেখানে আমার প্রস্তাব ছিল কলেজ স্তরে ৩-৪ মাসের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও অ্যান্ত্রারপ্রেনিউরশিপ-র প্রশিক্ষণ চালু করার। যার খরচ বহন করবে সংশ্লিষ্ট কোম্পনাই তার সিএস আর ফান্ড থেকে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব থাকবে সনাজের প্রতি পেশাদার দায়িত্বপালন। একটা কলেজে একটা ব্যাচে খুব বেশি হলে ৭০০০০-৮০০০০ টাকা খরচ পড়বে। জহরী জহর চেনে ঠিক সেই রকম ৩০ মিনিটের আলোচনার পরে তিনি আমার কথা বুঝে গেলেন ও রাজিও হলেন। আলোচনায় আমি দেখলাম উনি একটা বাজে শব্দও খরচ করেননি। আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম, এমন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পেরে। বেশ গর্বও হচ্ছিল। ফিরে এসে আমাদের অফিস ও সংশ্লিষ্ট কলেজকে বোঝাতে গিয়ে আমার ঘাম ছুটে যায়। আমার কাছে, সবার প্রশ্ন ছিল আমাদের কী থাকবে? আমি বোঝাতে পারছিলাম না ওই সব বেকার ছেলে-মেয়েরা আমাদের সমাজের অঙ্গ। ওদের উন্নতি মানে সমাজের উন্নতি। ওদের প্রতি আমাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে। অনেক চেষ্টার পর ১৫টা কলেজ রাজি হয়। ঠিক আমরা ইনস্টিটিউট-র কনফারেন্স হলে একটা অনুষ্ঠান করে বিষয়টা প্রচার করবো। আমাদের ইনস্টিটিউট দেখলাম বেশি খরচ করতে রাজি নয়। তখন আমি বাধ্য হয়ে ওই বিজনেস লিডার-র পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টকে ফোন করলাম পুরো বিষয় জানিয়ে। আরো জানালাম তাঁর বিজনেস ক্লাসের খরচ দিতে গেলে আমাদের প্রতিষ্ঠান সমস্যায় পড়বে। উনি সব শুনে বলেন,'আমি যাবো'। উনি ওই দিন এসেছিলেন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন কলকাতায়। (৫ ঘন্টার জন্য)। নিজের খরচে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াইশো লোক হলে হাজির ছিলেন। ৪০টা কলেজের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। ওই সভায় উনি খুব শান্তবাবে বলেন, আমি এসেছি কারোর উপকার করতে নয়। আমার নিজের জন্য। এটা আমার মানসিক শান্তি। এই যে প্রোজেক্টটা মানস ঠাকুর চেষ্টা করছেন, সফল হলে বাংলা হবে এমএসএম-ইর নতুন রূপদাতা। যা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। এই প্রোজেক্টই বেকার সমস্যার সুরাহার উপায়।

যদিও আমি সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে ওই প্রোজেক্টটা সফল করতে পারিনি। পরে ওনার কাছে গিয়ে আমার অসাফল্যের কারণ জানাই। সেদিন উনি যা বলেছিলেন তা আজও মনে রেখেছি। সেদিন উনি বলেছিলেন- প্রথমত, জীবন একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু হারতে শিখতে হবে। হারার মধ্যে আনন্দ খুঁজতে হবে। দ্বিতীয়ত, অসম্ভব বলে কিছু হয় না। সময় ও অধ্যাবসায় ওপর ভিত্তি করে জীবনের পরিকল্পনা করতে হয়। তৃতীয়ত, শুধু কিছু শিক্ষিত লোকজনের কথা ভাবলে হবে না। ভাবনাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সবাইকে স্বপ্ন দেখাতে হবে। যেমন জাপান দেখায়। চতুর্থত, লোকের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে এক আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে। এটা জানতে হবে। এবার বলি, ওই মানুষটার নাম- সুব্রাহ্মনীয়াম রামোদরাই। টিসিএস কে টিসিএস বানিয়েছেন উনি। স্বপ্ন আর সংগ্রামের আর এক নাম সুব্রাহ্মনীয়াম। দেশের নামি দামি কর্পোরেট সংস্থার চেয়ারম্যান, অ্যাডভাইসার। দেশে-বিদেশে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। যেমন, পদ্মভূষণ, এশিয়া বিজনেস লিডার অফ দি ইয়ার ইত্যাদি। বিশাল মানষটার আত্মবিশ্বাস রয়েছে কিন্তু নেই অহংকার। আমি ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। জেনেছি মানুষ ও মনুষ্যত্বের পার্থক্য। উনি হলেন জীবন গড়ার কারিগর।

আজ শুধু তোমার জন্য

তনুশ্রী চক্রবর্তী

দেখা হল সেই কোণ নদীটার পাড়ে
নামটি যেন অনেক কালের চেনা
সব কিছু তার হারিয়ে পাওয়া ধন
মনের মাঝে সুর বাজে একটানা।।

প্রভাত হতে ঢের বাকি রোজ রাতে
কথার মালা ঝরবে নীরব সুরে
একটুখানি থামলে সংগোপনে
ঝনঝনিয়ে উঠবে হৃদয়পুরে।।

চিত্ত যখন আকুল হবে জেনো
হৃদয় হিসাব হবে এলোমেলো
তোমার লেখা এগিয়ে দিয়ে কেউ
বলবে , ঘরে আসছে দেখো আলো !

তোমার আছে বুক ভরা এক কথা
ফেরি করার নেই তো আড়ম্বর
বাঁধছ যে সুর সুরবালার হাতে
নতুন জয়ের গন্ধ লেখার পর ।।

সে কথা তো হয় না বুঝি শেষ
শান্ত মনেও ঝ মালিকা
পড়ছি আমি পড়ছ তুমি বুঝি
আঁকা কথার সেবক- সেবিকা।।

যে কবিতা লেখেনি

মানসকুমার ঠাকুর

যে লোকটা কবিতা লেখেনি - কোনোদিন
কোনো শরতের আকাশে, মেঘের স্তূপে
মনটাকে গুঁজে রাখেনি ক্ষণিক এ
যে মাধবী লতাই হাত রেখে
মনটাকে উদাস
সেও ভালোবাসে, ভালোবাসার কারাগারে-
সেই লোকটা যে কোনো কবিতা লেখেনি।

যে কোনোদিন সূর্যাস্তের রঙ্গীন আভায়
নিজেকে প্রশ্ন করেনি --
পূর্ণিমার ছন্দে তার মন উত্তাল হবে কি না!
সমুদ্রের ঢেউ, আছড়ে পড়া বালিতে
পা ভিজিয়ে ---
নিজেকে নিঙড়ে, কিছু লেখেনি
ভালোবাসার কথা ---
সেই লোকটা, যে কোনো কবিতা লিখেনি।

যে কোনোদিন ফাগুনের নিজের অভিমান উড়িয়ে দেয়নি
যে -- বিরহে নিজেকে অভিশাপ দেয়নি
নিজের মনের নগ্ন যন্ত্রণা
পাষান বেদীতে ছুড়ে দেয়নি,
তবুও সে লেখেনি, কোনো কবিতা লেখেনি।

তবুও তার ভেতরে ভালোবাসার আগুন জ্বলে,
কৃষ্ণচূড়ার লাল আভায়
নিজেকে করে রঙিন--
যে মন্দিরের দরজা বন্ধ রেখে
অন্তিম প্রার্থনায় মগ্ন
সেও কোনো প্রমাণ রাখেনি
যে লোকটা কোনো কবিতা লেখেনি।

যে প্রশ্ন করেনি কোনোদিন
নিঃশব্দ প্রেম ও প্রকৃতির মিলন কোথায়?
যে কোনোদিন জানতে চায়নি
তোমা ও আমার সম্পর্ক
সে ও কিছু খোঁজে- যা দেখেনি
সেই লোকটা লেখেনি, কোনো প্রেমের কবিতা লেখেনি,
কোনো কবিতার দীপ্ত শব্দে মন ভেজেনি
লেখেনি - সে কোনো কবিতা লেখেনি।

মেঘ ও তৃষ্ণা

প্রদীপ আচার্য

মায়াবী চোখে অমন করে
তাকাস না
আমি তো মেঘ, আমি তো আর
আকাশ না।

একটু নাড়া খেলেই ঝরে
পড়তে পারি
বৃষ্টি হয়ে তোকেই ছুঁয়ে
ফেলতে পারি।

এক পশলার দমকে তোর
ভিজলে শাড়ি
মেঘের ভিতর কত আগুন
বুঝবি নারী।

মেঘের বুকে তৃষ্ণা, আগুন
তৃষ্ণা রে
জল দে বরং, উসকে আগুন
দিস না রে।

এই যে মেঘ চাতক হয়ে
চাইছে জল
এমন সর্বনাশের মূলে
তুই না, বল?

জাতিস্মর

অমত্য পানি

জেগে আছ রাত
ঘুমোও নি চাঁদ
তবু চুম্বক তবু লোহা
কালোয় মিশে যায়
ধুসর এক মিশরীয় নিশাচর
এসব সময়ে প্রেম পায়
প্রেমিকের মতো
একমুঠো ধুলো আর অনেক
অনেক অনেক অনেক বারুদ
জেগে আছো রাত
আলতো করে পাতা উল্লম্ব ফাঁদ
চলে যেতে হবে আজ
চলে যেতে হবে বহুদর্শী
তাই কাছে এসে আশাবরী
চুম্বন দাও রক্ষিতা
এ চাঁদের শপথ
জাতিস্মর হব শুধু
স্মৃতিদের ফাঁকি দেব বলে।

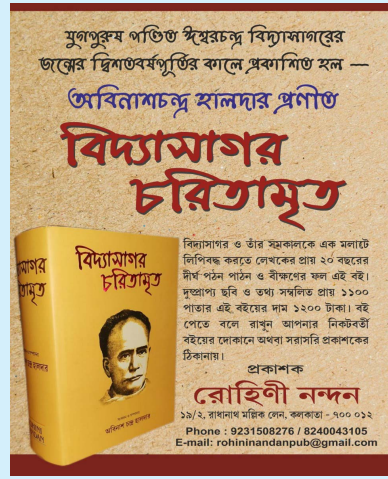

বনফুল ও রবীন্দ্রনাথ

মধুমিতা দাস

কাটিহারের কাছে গঙ্গার তীরে মণিহারির বাসিন্দা ছিলেন ডা: বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় যাঁর ছদ্মনাম ছিল বনফুল।

ডাক্তারি পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ডাক্তার হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন।পরে মণিহারি ছেড়ে ভাগলপুরে বসবাস শুরু করেন।

কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁরই কাহিনী নিয়ে হাটে বাজারে (একটি ট্রেন চলাচল করে এই নামে), অগ্নীশ্বর এসব সুপার হিট ফিল্ম তৈরি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাঁকে।

একবার খুব ভোরে বোলপুর পৌঁছেছেন বনফুল। তখনও বেশ অন্ধকার। ঠাণ্ডাও খুব। স্টেশনে নেমেই ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলেন তিনি। ট্যাক্সিওলাই খবর দিলে গুরুদেব এখন শ্যামলীতে আছেন।

বনফুল লিখছেন, 'শ্যামলীর সামনে যখন গাড়ি এসে থামল তখন দেখলাম শ্যামলীর সামনের বারান্দায় লণ্ঠন নিয়ে কে একজন বসে আছে।গাড়ি থামতেই সে উঠে দাঁড়ালো।'

--- 'ভাগলপুর থেকে ডাক্তারবাবু এলেন কি?'

--- 'হ্যাঁ'।

লোকটি এগিয়ে আসতেই চিনতে পারলাম নীলমনি।

আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।

বাবামশাই বললেন, 'ভোরের ট্রেনে আপনি আসবেন। চলুন, ভেতরে চলুন।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক কাপ গরম চা আর খান কয়েক বিস্কুট নিয়ে হাজির নীলমনি।

কাছেই হড়াস হড়াস করে জল ঢালার শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি পাশের ঘরেই।

--- কীসের শব্দ নীলমণি?

--- 'বাবামশায় চান কচ্ছেন।'

--- এই শীতে এত ভোরে?

--- রোজই তো করেন। আমি যাই খাবারটাবার ঠিক করি গিয়ে। এইবার খাবেন।'

তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আটাত্তর। সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের ব্রেকফাস্টের একটি অনন্য বর্ণনা দিয়েছেন বনফুল তাঁর লেখায়। আর সেই রাতেরই আরও এক সুন্দর অভিজ্ঞতার কথাও। আটাত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের ব্রেকফাস্ট।

নীলমণি খাবার নিয়ে প্রবেশ করল। দেখলাম প্রকাণ্ড একটি কাঁসার থালার মাঝখানে রূপোর বাটি দিয়ে কি যেন ঢাকা রয়েছে। আর তার চারপাশে তরকারির মতো কি যেন সাজানো রয়েছে সব। কোনওটাই পরিমাণে বেশি নয়, কিন্তু মনে হল সংখ্যায় অনেকগুলো। বারো- চোদ্দো রকম।

রবীন্দ্রনাথের সামনে থালাটি রাখতেই তিনি বাটিটি তুলে ফেললেন। সাধারণত থালার মাঝখানে যতখানি ভাত বেড়ে দেওয়া পরিমাণে প্রায় ততখানিই একটা সাদা জমানো জিনিস বেরিয়ে পড়ল বাটিটা তুলতেই ---

--- 'ওটা কি -'

--- 'ক্রীম। আর এগুলো নানা রকম ফল ভিজানো তুমি খাবে?'

লক্ষ্য করে দেখলাম মুগের ডাল, ছোলা, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট তো আছেই, আরো নানারকম কি আছে,একটা তো উচ্ছের বিচির মতো দেখাচ্ছিল। নীলমণি দুটো কাঁচা ডিম ভেঙে একটা ডিসে করে দিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন দিয়ে নিলেন। নীলমণি দু টুকরো মাখন মাখানো রুটিও আনল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ডিশে চুমুক দিয়ে ডিমটা খেয়ে নিলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো শিশি বার করলেন। একটায় দেখলাম মার্কের গ্লুকোজ আর স্যানাটোজেন। দুটো থেকেই দু চামচ করে বার করে

মেশালেন ক্রিমের সঙ্গে। তারপর কিসমিস পেস্তা সহযোগে খেতে লাগলেন সেটা। পরক্ষণেই কফি এলো। কাপে নয় কেতলিতে কফি ব্রু করার যে বিশেষ ধরনের কেতলি থাকে তাতে কেতলির ঢাকনির ওপর কাচের একটা ছোটো বালবের মতো ছিল। তার ভিতর দেখা যাচ্ছিল কফি ফুটছে।

পরমুহূর্তে আর এক কাজের লোক বনফুলের খাবার নিয়ে এল। গরম ফুলকো লুচি, আলুর ছেচকি, গরম সিঙারা, কচুরি সন্দেশ। তাছাড়া কেক, বিস্কুট, আপেল, কলা। তারসঙ্গে চায়ের সরঞ্জাম।

বনফুল খাচ্ছেন আর দেখছেন রবীন্দ্রনাথের খাওয়া। রবীন্দ্রনাথের খাওয়া শেষ হতেই নীলমণি থালাটা সরিয়ে নিয়ে পাঁউরুটি দু-খানা এগিয়ে দিল আর এক প্লেটে। রবীন্দ্রনাথ মধুর শিশি থেকে মধু বার করে তাতে মাখিয়ে খেতে লাগলেন। লক্ষ্য করলাম মধুটা বিদেশ থেকে আমদানি। অস্ট্রেলিয়ার মধু। রুটি খাওয়া শেষ করে রবীন্দ্রনাথ আবার টেবিলের ড্রয়ার খুললেন।সেখান থেকে এবার বেরল আর একটা ফাঁকামুখো শিশি। তাতে দেখি মুড়ি রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, মুখটা বড় মিষ্টি হয়ে গেল একটু নোনতা খেয়ে ঠিক করে নেওয়া যাক।

মুড়ির সঙ্গে কিছু কুসুম বিচি ভাজাও খেলেন তিনি। এরপর সেকালের বড় ব্রেকফাস্ট কাপের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দুধে ভরতি করে তার সঙ্গে কফি মেশালেন। কিছুক্ষণ পরে এল খেজুর রস। বনফুল- কে জিজ্ঞেস করলেন রবীন্দ্রনাথ, খেজুর রস খাবে? টাটকা রস এখনই পেড়ে এনেছে।

এক গ্লাস খেজুর রস খেলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, দু-এক চুমুক গরম চা খেয়ে নিলে কেমন হয়? তুমি এক কাপ নাও। আমাকেও এক কাপ দাও। দু একটা কচুরিও দিও আমাকে।

শান্তিনিকেতনে রাত নেমেছে। বনফুল খেয়েদেয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন। তখনো ঘুম আসেনি। হঠাৎ অনুভব করলেন তাঁর ঘরে কে যেন ঢুকে ঘুর ঘুর করছে।

বনফুল জিজ্ঞেস করলেন, কে?

রবীন্দ্রনাথের কাজের লোক উত্তর দিল, ' আমি বনমালী। আপনি ঘুমিয়েছেন কিনা বাবামশায় জিজ্ঞেস করলেন। হয়তো কিছু বলবেন আপনাকে।'

এবার বনফুলের লেখা থেকেই পড়া যাক: 'তখনই মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম। রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে দেখি তিনি একটা হাইপাওয়ারের বালব জ্বেলে বসে আছেন, দু হাতে দুটো কাচের গ্লাস। একটাতে দুধ রয়েছে, আর একটাতে মনে হয় সাবু। আমাকে দেখেই বললেন, ' বসো। আমি রাতের খাওয়াটা শেষ করে নিই। আজকাল রাতে দুধ সাবু ছাড়া আর কিছু খাই না।'

আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই দুধ-সাবু খাওয়া দেখানোর জন্য ডাকেননি, অন্য কোনও কথা আছে নিশ্চয়ই। কী সেটা, সবিস্ময়ে বসে বসে ভাবছিলাম সেই কথা। রবীন্দ্রনাথ দুধের সঙ্গে সাবু একটু একটু করে মিশিয়ে খাচ্ছিলেন। খাওয়া শেষ হলে রুমাল দিয়ে গোঁফ দাড়ি নিপুণভাবে মুছে আমার দিকে মৃদু হেসে চাইলেন। দেখলাম হাসির ঝিলিক চিকমিক করছে চোখের কোণে।

'আমার গান শুনবে? আমি এখনও গান গাইতে পারি, তবে আস্তে- আস্তে, গুন গুন করে গাই। বলো তো শুনিয়ে দিতে পারি এখনই'

আমি আর কি বলব। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম, ' আপনার কষ্ট হবে না তো?'

'না। কোন গানটা গাইব বলো?'

'আপনার যেটা খুশি। আর কি বলব।'

রবীন্দ্রনাথ সেদিন আমায় ' সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

কি যে অপূর্ব মনে হয়েছিল তা লিখে বর্ণনা করা যাবে না। মনে হয়েছিল যেন একটি তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ ভ্রমর সুরের অদ্ভুত মায়ালোক সৃজন করে গেল।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একবার এই বইটির প্রসঙ্গে লিখছিলেন --- "এই লাইনগুলো যতবার পড়ি মনকেমন করে রবীন্দ্রনাথের জন্য। কেমন যেন মায়া হয়। 'আমি এখনও গান গাইতে পারি' রবীন্দ্রনাথের এই কটি কথা চোখে জল আনে।"

এর বছর দেড়েক পরে তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে যান।

কোলেস্টেরল কমাতে খেতে পারেন রেড ওয়াইন

কীভাবে আটকাবেন হার্ট অ্যাটার্ক, ব্যালেন্স করবেন রক্তে কোলেস্টেরল, তা নিয়ে জরুরি পরামর্শ দিয়েছেন হার্ট বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অমিত রায়**

কোলেস্টরল আসলে কী ?

এটা একটা স্নেহজাতীয় উপাদান। শরীরের মধ্যে তৈরি হয়। কোলেস্টেরলকে জীবনদায়ী পদার্থও বলা হয়। আমাদের শরীরের বায়ো-হরমোন, ব্রেন ম্যাটার ও নিউরো জাতীয় পদার্থের জন্য এই স্নেহজাতীয় পদার্থটা দরকার। কারণ, বায়ো-হরমোন আমাদের শরীরে স্পিড বা চালিকা শক্তির পরিচায়ক। ব্যালান্স করতে সক্ষম হয় এই বায়ো-হরমোন। এই পদার্থটার বাড়া-কমার ওপর শরীরের সুস্থতা নির্ভর করে।

কোলেস্টেরলের বাড়া ও কমার ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকে ?

সাধারণত কোলেস্টেরলকে শরীরের ভেতরে তিনভাবে ব্যালেন্স করতে দেখা যায়। এইচডিএল কোলেস্টেরল, এলডিএল ও ভিডিএল কোলেস্টেরল। এই এইচডিএল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলডিএল বাড়াটা ব্যালান্স করে। তবে সাধারণভাবে এইচডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে থাকা ভালো। যে কোনো ধরনের হাই প্রোটিন লিভার বা যকৃতের মাধ্যমে ডিসলং করে বের করে দেয়। কিন্তু এই ব্যালান্স ঠিক না থাকলেই হার্টের ভেতর আর্টারিগুলো আটকে যায় তখনই হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থাকে। মানুষের শরীরে ৪০ এমজি ডেসিলিটার এইচডিএল থাকা দরকার। ফলে যে কোনোভাবেই হোক হার্ট অ্যাটাক এড়ানোর জন্য এইচডিএল বাড়াতে হবে ও এলডিএল কমাতে হবে।

লক্ষণগুলো কী কী ?

ধমনী সরু হয়ে যাওয়ার ফলে এরিয়া জুড়ে প্রতি ইউনিটে যেভাবে রক্ত সঞ্চালিত হওয়া উচিত সেভাবে হতে পারে না। ফলে কাজ করতে গিয়ে হাঁফ ধরে যায়। বুকের ভেতর চাপ অনুভব হয়। বুক চিনচিন করে। শরীরে রক্ত আটকে যায়। তখনই কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থাকে।

ভালো থাকার উপায়

ভালো থাকার জন্য এইচডিএলকে বাড়িয়ে রাখা দরকার। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটা, হালকা ব্যায়াম, সাঁতার কাটা দরকার। কোলেস্টেরল অনেক সময় বংশগত হয়। এজন্য প্রথম থেকে ডায়েট ও সচেতনতা থাকলেই ভালো ও সুস্থ থাকা যাবে। প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি, ফলমূল খেতে হবে। পাঁঠার মাংস পুরোপুরি বাদ, তবে চিকেন চলতে পারে। কিন্তু যে কোনো ধরনের মাছ কোলেস্টেরল রোগীদের জন্য ভালো। কেননা মাছ হার্টের পক্ষে ভালো। মাছের তেলের মধ্যে ওমেগা অ্যাসিড ও মোনোফ্যাটি অ্যাসিড দুই-ই রয়েছে। শুনলে অবাক হতে হবে, প্রতিদিন নিয়ম করে রেড ওয়াইন খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো। ফরাসিদের কিন্তু কোলেস্টেরল থাকে না। কারণটা হল, ফ্রান্সের লোকেরা রেড ওয়াইন খায়।

বর্ষাতেও রানির মতো এক ঢাল রেশম চুল

কৃষ্ণা আচার্য, বিউটি থেরাপিস্ট

আকাশে কালো মেঘ আর ঝমঝম বর্ষা মানেই মাথার চুলেও আলো-কালো। বর্ষার জ্যাবজ্যাবে প্রভাবে, আবহাওয়া আর্দ্রতায় চুল নেতিয়ে থাকে। কিন্তু কে না চায় বর্ষার মাঝেও রেশম কালো চুল ফুরফুরিয়ে উড়ুক। তাই ঠিক কী কী করলে আবহাওয়ার প্রকোপ এড়িয়ে আপনার চুল থাকবে ফুরফুরে, জেনে নিন সেই টিপস। নিয়ম মেনে চললে সারা বছর আপনার চুল হবে দীপ্তিময়, রানি মুখার্জির মতো।

● তেলে চুল তাজা

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। তেলেই হবে চুল তাজা। পরিমাণ মতো নারকেল তেল গরম করে নিন। একস্ট্রা ভার্জিন নারকেল তেল হলে বেশি ভালো। চুলে শ্যাম্পু করার ঠিক ১-২ ঘণ্টা আগে ভালো করে মাথায় আর চুলের ডগায় ঘষে ঘষে লাগান। ১ ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে কন্ডিশনার লাগিয়ে নিন। বাড়তি জল তোয়ালে দিয়ে মুছে চুলে হিট-প্রোটেকট্যান্ট স্প্রে লাগান। তারপর একটা গোল ব্রাশ দিয়ে ব্লো ড্রাই করুন। চুল পুরো শুকিয়ে গেলে কয়েকটা ভাগে ভাগ করে প্রতিটা ভাগে ফ্ল্যাট আয়রন চালান। চুল মসৃণ দেখানোর জন্য সিরাম লাগিয়ে নিন ও একদম শেষে সাইন স্প্রে ছিটিয়ে নিন। সারা দিনের দৌড়ঝাঁপ আর আবহাওয়ার হামলা সামলানোর জন্য আপনার চুল একেবারে তৈরি।

● বর্ষার মেকআপ কিট

ব্যাগে রাখুন সানস্ক্রিন : বর্ষা হলেও সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে কিন্তু সমানে আপনার ত্বকের ক্ষতি করে যাচ্ছে। এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন না লাগিয়ে কখনো বাড়ির বাইরে পা রাখবেন না। ব্যাগে সানস্ক্রিনের ছোটো বোতল রাখুন।

ওয়াটারপ্রুফ আই মেকআপ : বর্ষার মরসুমে আপনার বিউটি কিটে এটা থাকবে না, হতেই পারে না। আর কিচ্ছু না থাকলেও আইলাইনার, কাজল আর মাসকারা যেন থাকে। আর অবশ্যই তা হতে হবে ওয়াটারপ্রুফ। আচমকা বৃষ্টি নামলেও জলে ধুয়ে বিপত্তি পোয়াতে হবে না।

গ্লসি লিপস্টিক : শুধু শীতে নয়, বর্ষাতেও ঠোঁট ফাটার সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় এসিতে থাকলে এই সমস্যা আরো বাড়বে। ভোগান্তি এড়াতে ব্যাগে রেখে দিন রঙিন লিপবামের ছোটো কৌটো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় লাগিয়ে নিন, মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনার ঠোঁট। লিপবাম পছন্দ না হলে ময়েশ্চারাইজিং লিপস্টিক চলতে পারে। প্লাম, চেরি রঙের লিপস্টিকে সকলের নজর কাড়তে পারেন। তবে গ্লসি লিপস্টিক এড়িয়ে চলুন।

কমপ্যাক্ট পাউডার : বর্ষাকালে মুখ তেলতেলে দেখায় সহজেই। তাই লিকুইড ফাউন্ডেশন তুলে রাখুন, তার জায়গায় আনুন কমপ্যাক্ট পাউডার। মুখে টেক্সচার আসবে, তেলতেলে ভাব থাকবে না।

● গোলাপী সুবাস : মেঘ কালো বর্ষা মানেই মনমেজাজের সারে বারোটা। স্যাঁতসেঁতে ভাব আর ভিজে থাকা মন ফুরফুরে করতে হাতের কাছে রাখুন গোলাপী সুবাসের বডি মিস্ট। মন ভালো হয়ে যাবে নিমেষেই।

হেঁসেল

মহানায়কের পছন্দের খাওয়া-দাওয়া

বাঙালির আবেগ ও নস্টালজিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মহানায়ক উত্তমকুমার। এখনো মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তিনি। বেশ ভোজন রসিক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম ছিল রসগোল্লা। তিনি রসগোল্লার ওপর কিছুটা নুন মিশিয়ে খেতেন বলে জানা যায়। সরাসরি চিনি এড়িয়ে যেতেই নাকি তিনি এমন কাণ্ড করতেন। মহানায়কের বাড়ির অন্দরমহল থেকে জানা যায় পোস্তের ওপর তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সেই সঙ্গে পছন্দ করতেন চিংড়ি মাছ, ভেটকি মাছ, পাঁঠার মাংস। সুপ্রিয়া দেবীর ময়রা স্ট্রিটের বাড়ি থাকাকালীনও প্রায়ই চলে আসতেন ভবানীপুরের বাড়িতে। মা চপলাদেবীর হাতের ভেটকি মাছের কাঁটাচচ্চড়ির টানে ভোজনরসিক মহানায়ক শনি-রবিবার হলেই হাজির হতেন পৈতৃক বাড়িতে। খাওয়ার সময় সুপ্রিয়া দেবী নিজে বসে সব খাবার বেড়ে দিতেন। নিজের হাতেই সবরকম রান্না করতেন উত্তমকুমারের জন্য। মহানায়ককে ভীষণ ভালোবাসতেন সুপ্রিয়া দেবী, তাঁকে যত্নও করতেন ভীষণ। রান্না করে খাওয়াতেন মহানায়কের পছন্দের খাবার। যার মধ্যে ভেটকি মাছের 'কাঁটাচচ্চরি'র গল্প হয়তো বা অনেকেই জানেন। মাছ, মাংস, মিষ্টি, ফল কিছুই বাদ রাখতেন না তিনি। কিন্তু খাবার টেবিলে গেলে আনন্দে দিশেহারা হয়ে যেতেন মহানায়ক। চুপ করে বসে ভাবতেন কোনটা দিয়ে শুরু করবেন।

চিংড়ি লতি

উপকরণ : কচুর লতি ২৫০ গ্রাম, ছোটো চিংড়ি ৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি আধ কাপ, লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, ভাজা জিরে গুঁড়ো ২ চা চামচ, তেল পৌনে এক কাপ, লবণ পরিমাণ মতো, কাঁচা লঙ্কা সামান্য।

পদ্ধতি : কচুর লতি ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে ২ ইঞ্চি লম্বা করে কেটে নিন। চিংড়ি মাছগুলো খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিন। পাত্র গরম হলে তেল ঢালুন। তেল ভালো করে গরম হলে এক চামচ জিরে গুঁড়ো ও কাঁচা লঙ্কা রেখে বাকি মশলা পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ভালো করে কষুন। মশলা কষা হলে লতি ও চিংড়ি মসলায় দিন। ২ মিনিট নাড়তে থাকুন। এরপর ৩ কাপ জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ৬-৭ মিনিট পর ঢাকনা খুলে কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিন। তারপর বাকি ১ চামচ জিরে গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন। জল শুকিয়ে তেল বের হলে পাত্র নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।

দত্তক নেওয়ার নিয়মনীতি

অমিত বর্মণ, আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট

দত্তক নেওয়া নতুন কিছু নয়। পুরাণে, ইতিহাসেও দত্তক নেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। রামের দিদি শান্তা তাঁর পালক বাবার রাজ্যের খরামুক্তিতে সাহায্য করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও ছিলেন দত্তকপুত্র। রাজেশ খান্না, নেলসন ম্যান্ডেলা, অ্যাপল কর্তা স্টিভ জোবসের মতো মানুষও বড় হয়েছেন পালক বাবা ও মার কাছে। এতসব জানা ও বোঝা সত্ত্বেও এখনও আমাদের দত্তক নেওয়ার মনোভাব ততটা ইতিবাচক নয়। এখনও দত্তক নিয়েছে শুনলে অনেকেই কৌতুহল প্রকাশ করেন। নিজের সন্তান হলে দত্তক ছেলেমেয়ে অবহেলার শিকার হন। অথচ সমাজের উন্নতির জন্য দত্তক নেওয়া উচিত। নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের বিষয়টা ছাড়াও দত্তকের মাধ্যমে একটা শিশুকে উন্নতমানের জীবনের নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। আশার কথা, অনেক দম্পতি এখন দত্তক নিতে এগিয়ে আসছেন। সন্তান দত্তক নিয়ে সুখী জীবনও কাটাচ্ছেন। তবে দত্তক নিতে চাইলে বেশ কিছু আইনকানুন রয়েছে। শিশুর সুরক্ষার জন্য ও অপরাধচক্র বন্ধ করার প্রয়োজনে দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা এখন আইন নির্দিষ্ট। পুরো প্রক্রিয়ার কোনও ধাপে সামান্যতম সমস্যা দেখা দিলেই আবেদন বাতিল হতে পারে। এখন কোনো মিশন, হোম বা হাসপাতাল থেকে বা অভাবী মা-বাবাকে টাকা দিয়ে সরাসরি দত্তক নেওয়া যায় না। আইনসম্মতভাবে দত্তক নেওয়ার জন্য প্রথমে ভারত সরকারের শিশু ও নারী কল্যাণ দফতরের অন্তর্গত সেন্ট্রাল অ্যাডপশন রিসোর্স অথরিটি (কারা) পোর্টালে গিয়ে অনলাইন (cara.nic.in) আবেদন করতে হয়। যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখে তা পরিদর্শনের পর ওই আবেদন মঞ্জুর বা খারিজ করা হয়। আবেদন মঞ্জুর হলে কিছুদিন অপেক্ষার পর আদালতের তত্ত্বাবধানে শিশু বাড়িতে আসে।

কারা দত্তক নিতে পারেন

ভারতীয় নাগরিক, প্রবাসী ও বিদেশিরা ভারত থেকে শিশু দত্তক নিতে পারেন। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রের নিয়ম আলাদা হবে। যাঁরা দত্তক নিতে চান তাঁদের শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরো সুস্থ থাকতে হবে। আর্থিক সঙ্গতির প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। বিবাহিত দম্পত্তি ছাড়াও অবিবাহিত নারী ও পুরুষ দত্তক নিতে পারেন। বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে বিয়ের দুই বছর পর থেকে তাঁরা দত্তক নেওয়ার জন্য যোগ্য। তবে দু'জনের সম্মতি দরকার। অবিবাহিত কোনও নারী ছেলে বা মেয়ে

যে কাউকে দত্তক নিতে পারেন। কিন্তু অবিবাহিত পুরুষরা কোনো মেয়েকে দত্তক নিতে পারেন না। দম্পতির ক্ষেত্রে অন্তত একজনের ও সিঙ্গল পেরেন্টের ক্ষেত্রে শিশুর বয়সের অন্তত ২৫ বছর পার্থক্য হতে হবে। দম্পতির মোট বয়সের যোগফল ১১০ বছরের কম ও সিঙ্গল পেরেন্টের বয়স ৫৫ বছরের কম হতে হবে। তিনটি বা তার বেশি সন্তান থাকলে সাধারণ অবস্থায় সন্তান দত্তক নেওয়া চলবে না। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, সৎ সন্তান বা যে বাচ্চাকে দীর্ঘদিন ধরে দত্তক দেওয়া যাচ্ছে না এমন কোনো শিশুকে দত্তক নেওয়া যায়।

কাদের দত্তক নেওয়া যায়

শিশু কল্যাণ কমিটি ঠিক করে কোন শিশু অনাথ, পরিত্যক্ত। সাধারণত, যে শিশুর আইনি বাবা-মা বা অভিভাবক নেই, অথবা শিশুকে অনাথ গণ্য করে দত্তক দেওয়া হয়। যে শিশুকে রেলের কামরা বা অন্য কোথাও পাওয়া গেছে বা যাকে তার মা অভাব বা লোকলজ্জার কারণে রেখে দিয়ে গিয়েছেন তাকেও আইনসঙ্গতভাবে দত্তক দেওয়া হয়। কয়েক মাস থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের দত্তক নেওয়া যায়।

দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া

কারা'র ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের পর ই-মেলের মাধ্যমে দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়া এগোবে। আবেদন মঞ্জুর হলে, কারা সংস্থার পক্ষ থেকে সমাজসেবী দত্তক নিতে আগ্রহীদের বাড়ি গিয়ে তাঁর বিষয়ে বিশদ তথ্য ও খোঁজখবর নেন। পরিবার, পাড়া বা কাজের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন করা হয়। দরকার মনে হলে দম্পতির জন্য কিছু কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হতে পারে। দরকারে কাউন্সেলিংয়ের ফলাফল যায় আদালতের কাছে। হোম সার্ভের ফলাফল ভালো হলে, কিছু দত্তক কেন্দ্রের তথ্য ও শিশুর প্রোফাইল আসবে ইমেল মারফৎ। বাচ্চার মেডিকেল রিপোর্টও আলোচনা করা হয়। দরকারে বাচ্চাটির সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ দেওয়া হবে হবু বাবা-মাকে। যাতে দু'পক্ষ নিজেদের মতো করে বুঝতে পারে।

দত্তক নেওয়ার পর

কাউন্সেলিংয়ের সময়ই অভিজ্ঞ সমাজসেবীরা বুঝে নিতে পারেন, কোন বাবা-মা দত্তক সন্তানকে বাড়ি আনার পর তাকে বুক দিয়ে আগলে বড় করে তুলবে। আগামী দিনে সন্তানের লালনপালনে ত্রুটি রাখবেন না।

কতটা সময় লাগে

কারা'র পদ্ধতিতে কিছুটা সময় লাগে। গোটা প্রক্রিয়া শেষ হতে মোটামুটিভাবে ১৮-২৪ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে আজীবন সন্তানের সঙ্গসুখের জন্য অপেক্ষা করা যেতেই পারে।

চেহারার সঙ্গে মানানসই পোশাক

রূপালি জগতের স্টারদের দেখে, আমরা অনেক সময় তাঁদের মতো সাজগোজ করতে উঠেপড়ে লাগি। এই দোকান, সেই শপিং মল ঘুরে একইরকম স্টাইলের পোশাক কিনতে পারলে যেন শান্তি। কিন্তু পোশাক বা ফ্যাশন অনুকরণ করলেই তো হল না। আগে দেখে নিতে হবে, ওই পোশাকে আমাকে কেমন মানাবে। গুচ্ছ গুচ্ছ টাকা খরচ করে স্টাইলিশ পোশাক কিনে যদি সেটা ঠিকমতো ক্যারি করতে না পারি বা দেখতে খারাপ লাগে তাহলে কোনও লাভই নেই। ফ্যাশন ডিজাইনার প্রমিত মুখার্জির কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাক কোন চেহারায় কেমন পোশাক মানাবে। মানুষের চেহারার গঠন নানা ধরনের হয়। কারো ওজন বেশি, কেউ আবার ওজন বাড়ছে না বলে কষ্ট পাচ্ছে। কেউ লম্বা দেখানোর জন্য হিল পরে হোঁচট খায়, কেউ আবার একটু বেশিই লম্বা। আবার কেউ কেউ খুব সহজেই পেয়ে যান ছিপছিপে গড়ন বা এক্কেবারে পারফেক্ট স্লিম চেহারা। এই চার ধরনের চেহারার মধ্যে অনেক কম্বিনেশন দেখা যায়। তাই এই বিভিন্ন ধরনের চেহারায় আলাদা আলাদা পোশাক মানাবে।

● যাদের চেহারা ভারীর দিকে, তাঁরা সলিড কালারের ওপর নজর রাখবেন। চুড়িদার-কামিজ পরলে, কামিজটা সলিড কালার ও চুড়িদার ছোটো-ছোটো প্রিন্টের কাপড়ে বাছবেন। কামিজ একটু ডিপ নেকলাইন হতে পারে। এতে কাঁধ অনেকটা চওড়া কম লাগবে। পোশাকের মেটেরিয়াল সিল্ক বা শিফন হলে ভালো লাগবে।

● জিনস-টপ পরলে, সলিড কালারের ওপর টপ ও ছোটো-ছোটো মোটিফ প্রিন্টেড জিনস বা ট্রাউর্জাস পরবেন। এর সঙ্গে জাঙ্ক জুয়েলারি দারুণ জমজমাট।

তাই গলায় একটা ভারী জাঙ্ক নেকপিস পরলে বেশ লাগবে।

● যারা একটু রোগা চেহারার, তারা নানা ধরনের প্রিন্ট প্যাটার্ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। তবে বেশি ছোটো ছোটো প্রিন্টের দিকে না গিয়ে, একটু বড় মোটিফ বা প্রিন্ট বেছে নিলে দেখতে বেশি ভালো লাগবে। চুড়িদার কামিজ বা জিনস-টপ যাই পরুন না কেন, আপার ও লোয়ার পার্টে কখনো একই রকম প্রিন্ট পরবেন না। রোগা চেহারায় সুতির মেটেরিয়াল ব্যবহার করতে পারেন। এতে রোগাভাব অনেকটাই কেটে যাবে। এই ধরনের চেহারায় হাইনেক বা বন্ধগলা পোশাক পরলে ভালো লাগে।

● যাদের উচ্চতা কম, তাঁরা খেয়াল রাখবেন পোশাক যেন ওভার সাইজড না হয়। শর্ট প্যান্টস বা ক্যাপরি তো একেবারেই চলবে না। ছেলেরা শর্টস পরতে চাইলে হাঁটুর নীচে পরবেন না। মেয়েদের ক্ষেত্রে টপের লেন্থ যেন বেশি বড় না হয়, তা হলে দেখতে আরো বেঁটে লাগবে। রংয়ের ক্ষেত্রে ছোট-ছোট প্রিন্ট বা মোটিফের পোশাক পরতে পারেন। এঁদের ভার্টিকাল ধরনের প্রিন্টে একটু লম্বা দেখাবে। মনে রাখবেন, পোশাকের ওপরের অংশের রং হালকা ও নীচের অংশের রং গাঢ় রাখতে হবে।

● লম্বা যাঁরা, তাঁরা শর্টস, ক্যাপরি বা অ্যাঙ্কল লেংথ জিনস বা ট্রাউজার্স, অনায়াসে পরতে পারেন। মেয়েদের লং ড্রেস বা ম্যাক্সি ড্রেস বেশ ভালো লাগবে। লম্বা চেহারার জন্য চুড়িদার-কামিজ বানালে বড়-বড় প্রিন্টের কাপড় দিয়ে বানাতে পারেন। এতে আপনাকে ভালো লাগবে। তবে চেহারা যদি লম্বা ও রোগাটে হয় তাহলে খুব বড় প্রিন্ট না পরাই ভালো। এই ধরনের চেহারায় হরাইজেন্টাল প্রিন্ট বেশ ভালো লাগবে।

সচেতনতায় ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতিমারি ও লাগাতার লকডাউনের জেরে পুতুলনাচের শিল্পীরা জেরবার। গ্রামের শিল্পীদের জীবনে নেমে এসেছে অশনি সংকেত। আর্থিক বাধা সত্ত্বেও থেমে নেই ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার। এই কঠিন সময়ে দস্তাপুতুল, ডাণ্ডের পুতুল ও কথা বলা পুতুলের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে চলেছে ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার। এই সময়ের তাদের সাড়া জাগানো পারফরম্যান্স 'করোনা বালি', 'দুষ্টুচোর', 'কিছু হবে না' ও 'জগাইয়ের স্বপ্ন' সবার মন কেড়েছে। এসব পুতুলনাট্যের মাধ্যমে করোনা, করোনার টিকা দেওয়া, করোনা নিয়ে গুজব, অনলাইনে প্রতারণা প্রভৃতি সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। এই তো মাত্র কিছু দিন আগে ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের সদস্যরা উত্তর ২৪ পরগনার বাদুরিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে করোনার দ্বিতীয় ও আসন্ন তৃতীয় ঢেউ নিয়ে সচেতন করে এলেন।

বাংলার লুপ্তপ্রায় শিল্পের মধ্যে অন্যতম পুতুলনাচ। এই নাচে আকৃষ্ট হয়ে ও প্রশিক্ষিত হয়ে পাপেটিয়ার দিলীপ মণ্ডল তাঁর দল ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার নিয়ে ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছেন। নিছক বিনোদন নয়, ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার এইডস, ড্রাগ বিরোধী, মা ও শিশুর শরীরের যত্ন, পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতি সামাজিক ও শিক্ষার বিষয় নিয়ে ২০০৪ সাল থেকে কাজ করে চলেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সিকিম, অসম ও আন্দামান-নিকোবরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাঁরা কাজ করেন। শিশুদের শিক্ষার জন্য স্কুলে-স্কুলে পুতুলনাটকের অনুষ্ঠান করে, যা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকমহলে খুব জনপ্রিয়। এ ছাড়াও পুতুল শিল্প, পুতুল তৈরি, পুতুলনাট্যের উপস্থাপন ও প্রযোজনা প্রভৃতি বিষয়ে কর্মশালা করে। ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের এক অভিনব

উদ্যোগ 'পাপেট থেরাপি'। সাইকোলজিক্যাল থেরাপিতে পাপেটকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে সরোজ গুপ্ত ক্যানসার রিসার্চ সেন্টারের শিশুদের চিকিৎসায় এই পাপেট থেরাপি নিয়ে কাজ করে চলেছে ধূমকেতু পাপেট থিয়েটার। এ ছাড়াও এই সংস্থা শিশুদের সংশোধনাগারে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের মানোন্নয়নের জন্য পুতুল নিয়ে কাজ করে। সামাজিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ধূমকেতু দেশে-বিদেশের নানা প্রেক্ষাগৃহে পুতুল নাটকের নানা ধরনের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করে বিপুল খ্যাতি ও প্রশংসা পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে পেয়েছে জাতীয় স্কলারশিপ। সংস্থার কর্ণধার দিলীপ মণ্ডল পুতুল নিয়ে জি-বাংলা, ইটিভি বাংলা ও অন্যান্য বাংলা চ্যানেলে অনেক অনুষ্ঠান করেন। আকাশ ৮ চ্যানেলের 'লক্ষ্মীছানা' অনুষ্ঠানে তাঁর কথাবলা পুতুল ভূতু বাচ্চাদের খুব প্রিয় ছিল। পুতুলের স্বরক্ষেপণ নিয়ে তিনি ২টো বই লিখেছেন। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের শিক্ষা ও চলার পথে পুতুলের ব্যবহার ও পেশাদার কাজে পুতুলের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন পুতুল শিল্পী দিলীপ মণ্ডল। তাঁর গবেষণার নাম 'পাপেটস ফর লাইভ অ্যান্ড লাইভলিহুড'। এই দুঃসময়ে যাতে মানুষ সুস্থ ও ভালো থাকেন তাঁর জন্য নানা আঙ্গিকে নানা উপস্থাপন করে চলেছেন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে। পুতুলশিল্পী দিলীপ মণ্ডল জানান, 'মঞ্চের অনুষ্ঠান বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটে পুতুলনাচের শিল্পীরা অনেকে অন্য পেশায় চলে গেলেও, আমি বিকল্প কাজের কথা ভাবতে পারি না। এ জন্য নানা সোশাল মিডিয়াতে ছোটো ছোটো ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে কাজ করে চলেছি। পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমে ওয়ার্কশপ ও ট্রেনিং করে চলেছি। আমেরিকান ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান স্টাডিজে পাপেট নিয়ে অনলাইনে বাংলা ভাষায় ক্লাস নিচ্ছি। গত ২০১০ সাল থেকে এই কাজ করে চলেছি।' ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের কর্ণধার দিলীপ মণ্ডল পুতুলনাচকে নিছক মনোরঞ্জনের জন্য না ভেবে এই শিল্পকে সমাজের নানা স্তরে নানা বিষয়ের বার্তা হিসাবে ব্যবহার করেন। আর এখানেই তাঁর সার্থকতা ও সন্তুষ্টি ।

চিনের প্রাচীর — গোষ্ঠ পাল

সৃঞ্জয় ঠাকুর

বাংলার কিংবদন্তি ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন গোষ্ঠ পাল। পুরো নাম ছিল গোষ্ঠ বিহারী পাল। ওই সময়ের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মাদারীপুর মহকুমা এখন নড়িয়ার ভোজেশ্বর গ্রামে ১৮৯৬ সালের ২০ আগস্ট তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাঁর বাবা শ্যামলাল পাল ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। গোষ্ঠ পাল ছোটোবেলা থেকেই ফুটবল খেলা শুরু করেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি কলকাতার কুমারটুলি ক্লাবে যোগ দেন। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সেখানে খেলেন। মোহনবাগানের খেলোয়াড় রাজেন সেনগুপ্ত ও মেজর শৈলেন বসুর সাহায্যে তিনি ১৯১২সালে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী মোহনবাগান ক্লাবে যোগ দেন। এর আগের বছর মোহনবাগান বিদেশিদের হারিয়ে আইএফ এ শিল্ড জয় করেছিল।

১৯১৩ সালে তিনি মোহনবাগানের হয়ে প্রথম খেলেন। এরপর ২৩ বছর ধরে মোহনবাগানের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম যে দল গড়ে তাতে ছিলেন কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল। ১০২০ সালে ইস্টবেঙ্গল এক টুর্নামেন্ট হারকিউলিস কাপে খেলতে মোহনবাগান থেকে তাঁকে হারায়ে নেওয়া হয় ও চ্যাম্পিয়ন ও হয় লাল-হলুদ। ১৯২১ সাল থেকে টানা ৫ বছর তিনি ছিলেন মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন। ১৯২৪ সালে তিনি ভারতীয় দলেরও অধিনায়কত্ব পান। তিনি খেলতেন রাইট ব্যাক পজিসনে। আই এফ এ শিল্ড জয়ী দলের সদস্য ভূতি সুকুল, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হাবুল সরকারের সঙ্গে জুটি বেঁধে গোষ্ঠ পাল মোহনবাগান দলের রক্ষণ সামলানো শুরু করেন। খেলার সময় বুটপরা ইউরোপিয়ান খেলোয়াড়দের তিনি খালি পায়ে খেলে প্রতিরোধ করতেন। ভারতীয় দল নিয়ে তিনি ১৯৩৩ সালে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) যান। তিনি হকি খেলাতেও দক্ষ ছিলেন। ক্রিকেট ও টেনিস ও খেলতেন। ১৯৩৫ সালে অবসর নেন।

১৯৬২ সালে গোষ্ঠ পাল ভারত সরকারের পদ্মশ্রী উপাধি পান। তিনি ছিলেন প্রথম ফুটবল খেলোয়াড় যিনি পদ্মশ্রী উপাধি পান। দৈনিক ইংলিশম্যান তাঁকে চিনের প্রাচীর উপাধি দেন। ১৯৮৪ সালে কলকাতায় তাঁর নামে তৈরি হয় ভাস্কর্য। খালি পায়ে ফুটবল খেলার ঔদ্ধত্যটাই বোঝানো হয়েছে এই ভাস্কর্যে। এই মূর্তির নীচে লেখা আছে, 'ভারতীয় ফুটবলে সর্বকালের সেরা ব্যাক। সে যুগে বুটপরা ইউরোপীয় ফুটবলারদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলে দুর্ভেদ্য চিনের প্রাচীর নামে খ্যাত। খেলার মাঠে স্বজাতি সম্মান প্রতিষ্ঠায় ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষে অন্যতম সৈনিক'। ইডেন গার্ডেন্স ও মোহনবাগান মাঠের সামনে দিয়ে যাওয়া কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটার নাম গোষ্ঠ পাল সরণি। তাঁর স্মরনে ডাকটিকিট ও বের হয়। মোহনবাগান ক্লাব ২০০৪ সালে তাঁকে মরনোত্তর মোহনবাগান রত্ন উপাধি দেয়। এই ক্লাবের ভিতরে তাঁর নামে একটা সংগ্রহশালা 'গোষ্ঠ পাল সংগ্রহশালা' তৈরি হয়েছে। গোষ্ঠ পাল ১৯৭৬ সালের ৮ এপ্রিল কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অফ সিজিনে বেড়ানো

বাঙালি মাত্রই পায়েরতলায় সর্ষে। অতিমারিও আটকাতে পারেনি বাঙালির বেড়ানোর তীব্র ইচ্ছাকে। তবে ঘুরতে যাওয়ার খরচ এখন বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই টাকা বাঁচাতে অফসিজনে বেড়াতে যেতে পছন্দ করেন। ওই সময় হোটেল ও গাড়ি ভাড়ায় বেশ কিছুটা ছাড় মেলে। এছাড়াও কিছু সরকারি পর্যটন দফতরও অফসিজনে নানা ধরনের প্যাকেজের ব্যবস্থা করে।

অফসিজনে কোথায় বেড়াতে গেলে সুবিধা মিলতে পারে তারও হদিশ থাকা দরকার। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের ট্যুরিস্ট কেন্দ্রগুলিতে নভেম্বর থেকে মার্চ অফসিজন। এই সময়ে কম খরচে পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্রে ঘোরা যায়। বর্ষাকালেও পাহাড়ি অঞ্চলে অফসিজন থাকে। তবে ওই সময় বৃষ্টি নানা বিপদ ডেকে আনে। বর্ষাকালে পাহাড়ি এলাকায় ধস নামে। তাই ওই সময় পাহাড়ে ঘুরতে না যাওয়াই ভালো। হিমাচল প্রদেশের লাহুল, স্পিতি ও কাশ্মীরের লাদাখ জুন থেকে অক্টোবর মাসে ঘুরে আসতে পারেন। অন্য সময় বরফে ওই সব অঞ্চলের পথঘাট বন্ধ থাকে। দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত অফসিজনের ছাড় মেলে। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে বর্ষার সময় না যাওয়াই ভালো। মহারাষ্ট্রের শৈলশহর বিশেষ করে লোনাভালা, খান্ডালা, পাঞ্চগনি, মহাবালেশ্বর এপ্রিল থেকে আগস্ট পোক সময়। বর্ষাতেও এখানে পর্যটকদের ভিড় হয় বৃষ্টির শোভা দেখার জন্য। এই অঞ্চলে অফসিজন সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাস।

জঙ্গল ঘুরতে যাওয়ার সেরা সময় মার্চ থেকে মে মাস। এই সময় বন্য প্রাণীদের দেখার সুযোগ বেশি থাকে। আর পিক সিজনও থাকে না। বেড়ানোর খরচও কমে। সমুদ্র বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অফসিজন চালু থাকে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর। বর্ষায় সাগরের উত্তাল রূপ দেখার জন্য ওই সময়ে পর্যটকরা সাগর সৈকতে ঘুরে মজা নিতে পারেন। দেশের অন্য পর্যটনকেন্দ্র বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান সমতলে ঘুরতে যেতে পারেন মার্চ, সেপ্টেম্বরে। ওই সময় খরচ কম হয় অফসিজনে। এইসব অঞ্চলে পিক সিজন অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি। দেশের প্রায় সব পর্যটন কেন্দ্রে বড়দিনের সময়, ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে পিক সিজন থাকে। ওই সময়ে খরচ বেশি হয়। বিশেষত মেলা-উৎসবের সময়ও খরচ বাড়ে।